২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন

□ সাত টাকা

আনন্দমেলা

□ অদ্রীশ বর্ধনের গোয়েন্দা-গল্প

□ কালিপোখরির গুহায় অ্যাডভেঞ্চার

ওয়াসিম আক্রমের পোস্টার

বীর সামুরাই

সামুরাইদের জীবন মানেই সাহস আর যুদ্ধ। কারা এই সামুরাই ?

বিশ্বের সেরা এক লাইব্রেরি

ফাস্টবোলার বিবেক রাজদান

স্কুলের কম্পিউটার

ইলেকট্রনিক্স গেম

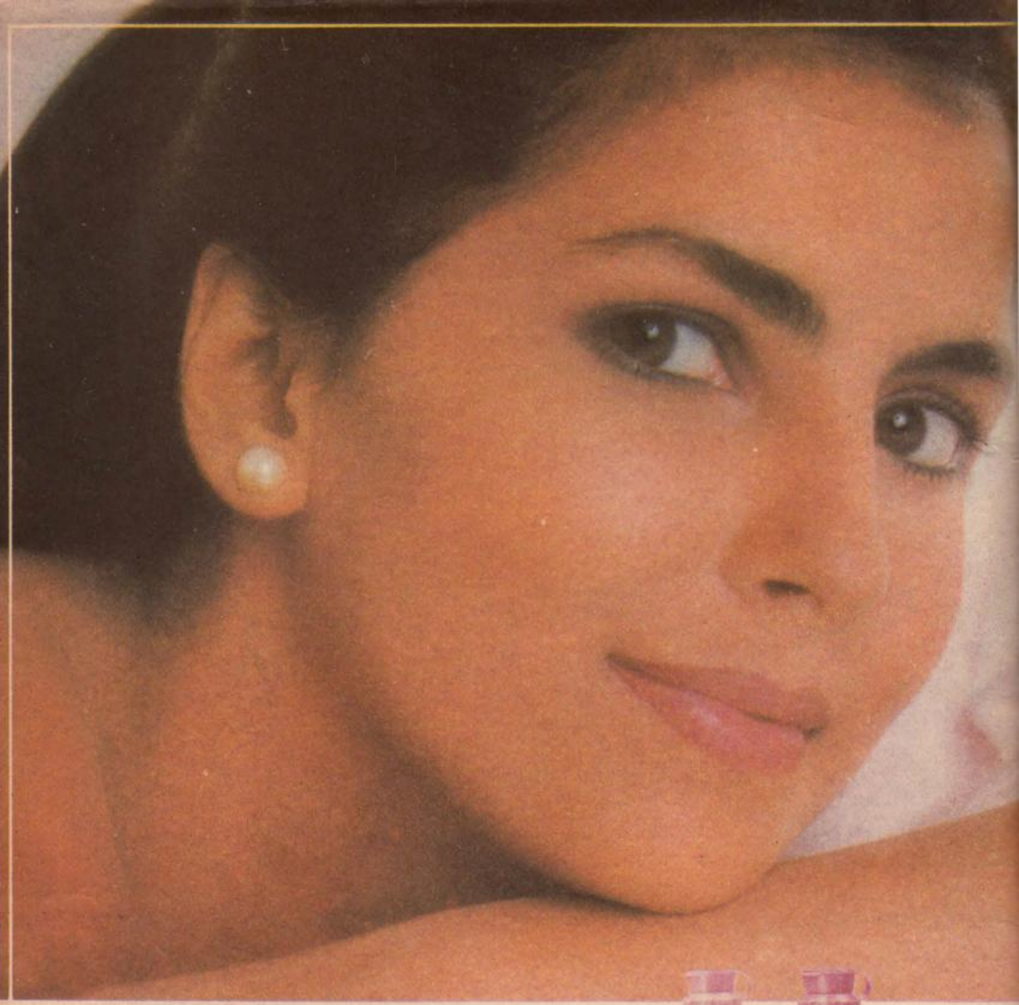

আপনার রঙরূপের বয়েস কি আপনার আসলে বয়েসের চেয়েও বেশী দেখাচ্ছে?

আপনার রঙরূপের জৌলুষ কাল কেমন থাকবে, তা নির্ভর করে, আজ আপনি তার কিভাবে দেখাশোনা করছেন, তার ওপর। কারণ, বয়েস বাড়ার সাথে সাথে, ত্বকের আর্দ্রতা কমে যেতে থাকে—তাই, দরকার, জনসন্স বেবী লোশন-এর ময়েশ্চারাইজিং-এর গুণ।
এ পাবেন আপনার বেছে নেওয়ার মত দুটি ফর্মুলেশনে—লোশনটি ত্বকের গভীরে ঢুকে কাজ করে, আর এর বিশেষ ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বকে পুষ্টি যোগায়—আর, আপনার ত্বক অপূর্ব কোমল ও তরতাজা ক'রে রাখে, ফলে আপনার রঙরূপেও যেন চির-বসন্তের ছোঁওয়া লাগে!

রেগুলার
শুষ্ক ত্বকের জন্যে এক বিশেষ ময়েশ্চারাইজারযুক্ত উপাদানের মিশ্রণ

লো অয়েল
তেলতেলে ত্বকের জন্যে হাল্কা, সূক্ষ্ম ফর্মুলা

জনসন্স বেবী লোশন

কারণ, নরম ও মোলায়েম ত্বক আপনার বয়স গোপন রাখে।

জনসন অ্যাণ্ড জনসন

OBM/4573 BEN

GL/13C/224BEN

১২

জাপানের সামুরাইদের মতো বীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এখনকার ঐতিহাসিকদের মতে, সামুরাইরা আসলে 'বুশি' বা 'বুশিডান' নামের যুদ্ধবাজ দল। একসময় সামুরাইদের সংখ্যা ছিল সাড়ে চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ। তাঁদের নিয়ে ছবি করেছেন জাপানের বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার আকিরা কুরোসায়া। 'সেভেন সামুরাই' নামের সেই ছবিও দেশে দেশে সুনাম অর্জন করেছে। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে আছে সামুরাইদের জীবনবৃত্তান্ত। তাঁরা কী কী অস্ত্র ব্যবহার করতেন, কেমন হত তাঁদের তরোয়াল, কবে থেকে তাঁরা হাতে তুলে নিয়েছিলেন আগ্নেয়াস্ত্র—আলোচনা করা হয়েছে এসব কথাও।

২৬

নানা ধরনের কেরিয়ারের কথা আলোচনা করা হয় 'কেরিয়ার গাইড' বিভাগে। এবার আলোচনা করা হল বন-প্রশাসক বা বন-ব্যবস্থাপক হওয়ার কথা। ভোপালের 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট'-এ এই কেরিয়ার গড়ে তোলা যায়।

৪৫

বিশ্বকাপ ফুটবলের মূল পর্বের আসর বসতে আর দেরি নেই। অংশ নেবে ২৪টি দেশ। প্রাথমিক পর্বের সব পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এবারই শুরু হবে আসল পরীক্ষা। খেলোয়াড়রা তৈরি হচ্ছেন। সেইসঙ্গে তৈরি হচ্ছেন কোচ বা ম্যানেজাররাও। বস্তুত, তাঁদেরও এটা পরীক্ষা। ম্যানেজাররা কে কী ভাবছেন, কে কীভাবে তৈরি হচ্ছেন, তা নিয়ে প্রকাশিত হল একটি নিবন্ধ।

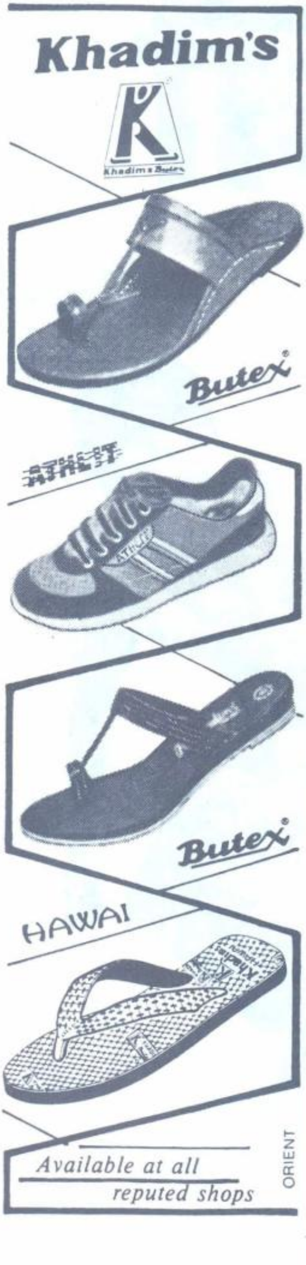

৭৫

পূর্ব হিমালয়ের কোলে ভারত-নেপাল সীমান্তের একটি গ্রাম কালিপোখরি। সেই গ্রামের কাছেই আছে রহস্যময় একটি গুহা। এবারের অ্যাডভেঞ্চার ঝোপঝাড় ও আগাছায় ঢাকা ওই গুহার অন্ধকারে। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। ফাটলের মুখে বড় একটা পাথরের চাঁই। তাতে পুরু হয়ে জমে আছে শ্যাওলা। আর, পাথরের চাঙড়ের ঠিক পাশেই একজন মানুষ ঢুকে যেতে পারে, এরকম একটা সরু গর্ত। সেখানে ঢুকলে পথ ভুল হয়ে যেতে পারে। মনে হবে গোলকধাঁধা। অজানা আতঙ্ক। গা ছমছম করে। কী ঘটল কালিপোখরিতে সেই অভিযানে?

৮ ফাল্গুন ১৩৯৬ □ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
১৫ বর্ষ ২২ সংখ্যা

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
সাধুচরণের বাগাল শিবতোষ ঘোষ ৬০
গোয়েন্দা গল্প
ধরণীর খোঁজে অদ্রীশ বর্ধন ৩২
প্রচ্ছদকাহিনী
বীর সামুরাই শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় ১২
ধারাবাহিক উপন্যাস
উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২১
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭৮
বিশ্ববিচিত্রা
বিশ্বের সেরা এক লাইব্রেরি সন্তোষকুমার দে ৭
কমিকস
গাবলু ৩১, টারজান ৫৩, রোভার্সের রয় ৫৭, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩
কবিতা
স্মৃতি শান্তিকুমার দাস ৫৯
বিচ্ছুর সমস্যা সনৎকুমার মিত্র ৫৯
টাকাকড়ি
টাকার জন্ম : দ্বিতীয় পর্ব ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯
প্রযুক্তিবিজ্ঞান
স্কুলের কম্পিউটার পবিত্রকুমার চক্রবর্তী ৫৪
কেরিয়ার গাইড
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট অমর দাশ ২৬
অ্যাডভেঞ্চার
কালিপোখরির অন্ধকার গুহায় অরিন্দম দেবনাথ ৭৫
ক্যাম্পাস
কলকাতাকে সুন্দর করে তুলতে রতনতনু ঘাটী ২৫
খেলাধুলো
মনোজ প্রভাকর ৪১, ওয়াসিম আক্রম ৪২
বিশ্বকাপ : চব্বিশজনের ঘুম নেই সন্দীপ বসু ৪৫
আশা জাগালেন জাগালো ৪৫
রাজদানের লড়াকু মনোভাব গৌতম ভট্টাচার্য ৪৬
চেতনকে কি ডাকা হবে অনুপ সেনগুপ্ত ৪৭
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪৮
খেলার খবর ৫২
নিয়মিত বিভাগ
চিঠিচাপাটি ৬, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, আঁকিবুকি ২২, কুইজ ২৮, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫১, ইলেকট্রনিক্স গেম ৬৪, শব্দসন্ধান ৬৬, আকাশে ওড়ার কথা ৬৮, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

■ আগামী সংখ্যায় ■

নতুন ধারাবাহিক

কম্পিউটারের ভাষা

কম্পিউটারের এখন ব্যাপক প্রসার। বিজ্ঞান, শিক্ষা ও বাণিজ্য থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে কম্পিউটার নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে কম্পিউটার-জানা পঁচাশি হাজার কর্মীর প্রয়োজন নানা ধরনের চাকরিতে। 'আনন্দমেলা'য় শুরু হচ্ছে **নতুন ধারাবাহিক 'কম্পিউটারের ভাষা'**। 'আনন্দমেলা' পড়েই সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউ প্রোগ্রাম লিখে কম্পিউটারকে দিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করাতে পারবে। জটিল বিষয়কেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে সহজ ভাষায়। অসীমরতন ঘোষের ধারাবাহিক এই লেখার সঙ্গে থাকছে অজস্র ছবি।

তানাজি সেনগুপ্তের প্রচ্ছদকাহিনী

রিচার্ড হ্যাডলি

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ

দেশে দেশে টাকার আবির্ভাব : পশ্চিম এশিয়ায় ও ইউরোপে

আনন্দ বাগচীর সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

রহস্যের আলোছায়া

চিত্রা দেবের ইতিহাসের গল্প

সিংহাসনের উত্তরাধিকার

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

ছবি-ছড়া
আর
গল্পে ভরা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
● টুনটুনির গল্প ৩·০০
সুকুমার রায়
● খাগড়াই ৪·০০
● পাগলা দাশু ১০·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
● আষাঢ়ে স্বপ্ন বা জানোয়ারের মেলা ৩·০০
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
● শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে ৫·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
● কুমির সাহেব ৩·০০
লীলা মজুমদার
● জানোয়ার ৪·০০
শৈল চক্রবর্তী
● ছড়ার দেশে টুলটুলি ৬·০০
মীরা বালসুব্রমনিয়ন
● তিনটি তামার পয়সা ৭·০০
গৌরী ধর্মপাল
● চোদ্দ পিদিম ৬·০০
নির্মলেন্দু গৌতম
● বনজঙ্গল ৭·০০
বুদ্ধদেব গুহ
● মি হাবিজাবি ৬·০০
চিত্তরঞ্জন মাইতি
● ছড়া ছবিতে যানবাহন ৪·৫০

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯

চিঠিচাপাটি

সেরাটোথেরিয়াম সিমাম দুই খড়্গ-বিশিষ্ট

'আনন্দমেলা' ২৯ নভেম্বর ১৯৮৯ সংখ্যায় স্বপনকুমার দাসের 'বিপন্ন গণ্ডার' প্রচ্ছদকাহিনীটি পড়ে গণ্ডার

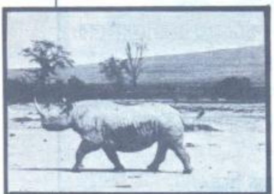

সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। গণ্ডারের ইতিহাস, প্রজাতি, স্বভাব, ওজন এবং সর্বোপরি গণ্ডারের অস্তিত্বের বিপন্নতার কথা লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তবে লেখার সঙ্গে আরও কিছু রঙিন ছবি থাকলে ভাল হত।

তবে প্রচ্ছদকাহিনীটির একটি জায়গায় লেখক বলেছেন যে, সেরাটোথেরিয়াম সিমাম প্রজাতির গণ্ডার দুই খড়্গ-বিশিষ্ট। কিন্তু একটি বইয়ে দেখলাম যে, এই প্রজাতির গণ্ডার এক খড়্গ-বিশিষ্ট। কোনটি ঠিক, যদি জানান ভীষণ উপকার হয়।

সানজু দেওয়ান
কলকাতা-২

লেখকের উত্তর : সেরাটোথেরিয়াম সিমাম বা আফ্রিকার চওড়ামুখো (বা সাদা) গণ্ডার দুই খড়্গ-বিশিষ্ট। এক খড়্গ-বিশিষ্ট গণ্ডার কেবল এশিয়ায় পাওয়া যায়।

গোয়েন্দা গল্প চাই

আমি 'আনন্দমেলা'র একজন নিয়মিত পাঠক। ২৪ জানুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'বইমেলা' পড়ে খুব ভাল লাগল। দেশ-বিদেশের গোয়েন্দা গল্প পড়তে চাই।

টিঙ্কু মল্লিক
কোড়লা, হাওড়া

এপকট সেন্টার ডিজনি ওয়ার্ল্ডেরই একটি অংশ

'রোমাঞ্চকর এপকট সেন্টার' প্রচ্ছদকাহিনীটি ১৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় পড়লাম। লেখাটি খুবই ভাল লেগেছে। তবে লেখাটির মধ্যে দুটি তথ্য সম্বন্ধে আমার কৌতূহল রয়েছে। এপকট সেন্টার-এ জার্নি টু ইমাজিনেশানের বাড়িটি কোডাক কম্পানি উপহার দিয়েছে, হরাইজনস প্যাভিলিয়ন যেমন উপহার দিয়েছে জেনারেল ইলেকট্রিক কম্পানি, সেরকম কমিউনিকোর সেন্টার এবং দি লিভিং সিজ-এর প্রস্তুতকর্তা কোন কম্পানি? আর-একটি প্রশ্ন—এইরকম বড় এপকট সেন্টার ঘুরে দেখতে কমপক্ষে কত সময় লাগে? মোট কত আমেরিকান ডলার লাগে এই সেন্টার দেখার জন্য?

অন্তু ও সন্তু সেনগুপ্ত
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

লেখকের উত্তর : জার্নি টু ইমাজিনেশান যেমন কোডাক এবং হরাইজনস যেমন জেনারেল ইলেকট্রিক কম্পানি উপহার দিয়েছে, কমিউনিকোর সেন্টার এবং দি লিভিং সিজ—তেমন কোনও বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপহার নয়। কয়েকটি প্যাভিলিয়ন এপকট

সেন্টারের কর্তৃপক্ষ নিজেদের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। ওই দুটিও তাঁদের বিশেষজ্ঞদের তৈরি।

এপকট সেন্টারটিকে ডিজনি ওয়ার্ল্ডের একটি অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই ডিজনি ওয়ার্ল্ডের জন্য টিকিট কেটে ঢুকলেই হল, এপকট সেন্টারের জন্য কোনও পৃথক টিকিট লাগে না। এমনকী ডিজনি ওয়ার্ল্ড থেকে এপকট সেন্টার, যে উঁচুনিচু কংক্রিটের থামের উপর দিয়ে মনোরেলে চেপে যেতে হয়, তার জন্যও পৃথক ভাড়া লাগে না।

আমি গিয়েছিলাম ১৯৮৩ সালে, তখন ডিজনি ওয়ার্ল্ডের পঞ্চদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব চলছিল। তখন প্রত্যেকের জন্য পনেরো ডলার করে টিকিট কিনে ডিজনি ওয়ার্ল্ডে ঢুকেছিলাম। এখন টিকিটের দাম বেড়েছে কি না আমার জানা নেই।

ডিজনি ওয়ার্ল্ড এবং এপকট সেন্টার ভালভাবে ঘুরে দেখতে হলে দিনের পর দিন কেটে যেতে পারে। অনেকে সেভাবে ওখানে বেড়াতে গিয়ে কয়েকদিন থাকেনও। থাকার জন্য পর্যটকদের বসবাসের উপযোগী নানা ধরনের হোটেল আছে। তবে থাকার খরচ বাঁচাতে হলে একটি গোটা দিন এবং রাতের ঘণ্টা চারেক সময়ে ঘুরে দেখা যায়। বিশেষ করে রঙিন আলোর রোশনাই আর আতসবাজির বিস্ময়কর খেলা এবং লেসাররশ্মির জাদু প্রভৃতি তো শুধু রাত্রে দেখানো হয়।

ক্যারাটে নিয়ে প্রশ্ন

মন দিয়ে 'আনন্দমেলা'র প্রতিটি সংখ্যাই পড়ি। কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস বিভাগে প্রকাশিত ক্যারাটে সম্পর্কে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। (১) যখন ঘুসি মারা অভ্যাস করব, তখন দেওয়াল বা অন্য শক্ত কিছুতে ঘুসি মেরে অভ্যাস করব?
(২) ঘরের ভিতরে ক্যারাটে অভ্যাস করব, না খোলা মাঠে?
(৩) আমি আগে অ্যাথলেট ছিলাম। তখন কোচ বলতেন, মুখ খুলে অভ্যাস করা উচিত। ক্যারাটে অভ্যাস করার সময় মুখ খুলে অভ্যাস করব, না মুখ বন্ধ রেখে?
(৪) ক্যারাটে শেখার পরে কোনও বেল্ট নিতে হলে কী করতে হবে?
(৫) ক্যারাটে শেখার জন্য অ্যাথলেটিক্স ছেড়েছি। একইসঙ্গে কি দুটো শেখা যায়?
(৬) গুয়াহাটিতে এখন কি ক্যারাটে শেখার কোনও স্কুল আছে?

পিউ বন্দ্যোপাধ্যায়
গুয়াহাটি, অসম

লেখকের উত্তর : ক্যারাটে নিয়ে আপনার প্রশ্নগুলি বেশ ভাল।
(১) প্রতিপক্ষকে কল্পনা করে শরীরের যে অংশে যেভাবে ঘুসি মারার কথা আলোচনা করেছি, সেইভাবে হাওয়ায় হাত ছোঁড়া অভ্যাস করতে হবে। কখনওই দেওয়ালে বা শক্ত কিছুতে ঘুসি মারা উচিত নয়।
(২) খোলা মাঠেই ক্যারাটে অভ্যাস করা ভাল। তবে কাছাকাছি মাঠ না থাকলে ঘরে অভ্যাস করা যায়।
(৩) ক্যারাটের প্রত্যেকটি কৌশল অনুশীলন করার সময় মুখ দিয়ে শব্দ (ক্যারাটেতে এই শব্দকে 'কিয়া' বলে) করে শ্বাস ছাড়া উচিত।
(৪) বেল্টের জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। কিওকুশিন ক্যারাটের অনুমোদিত শিক্ষাকেন্দ্রে এসে পরীক্ষা দেওয়া যায়।
(৫) শরীর সক্ষম হলে অ্যাথলেটিক্স এবং ক্যারাটে—দুটোই শেখা যায়। কখনও শরীর অবসন্ন লাগলে জোর করে দুটোই অভ্যাস করা ঠিক নয়। তখন একটিকেই বেছে নিতে হবে।
(৬) গুয়াহাটিতে এখনও পর্যন্ত ক্যারাটে শেখার কোনও কেন্দ্র তৈরি হয়নি।

প্রবেশপথের সিঁড়িতে রয়েছে এই ভাস্কর্য

বিশ্বের সেরা এক লাইব্রেরি

ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস-এর কথা লিখেছেন **সন্তোষকুমার দে**

সারা পৃথিবীর লোক যে লাইব্রেরিটিকে একডাকে চেনে, যেখানে গোটা দুনিয়ার ষাটটি ভাষার দেড় কোটিরও বেশি বই থরে থরে সাজানো, যার যে বই দরকার, কম্পিউটারের সাহায্যে মুহূর্তে এনে হাজির করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, যে লাইব্রেরির সংগ্রহশালার তাকগুলি পাশাপাশি সাজালে ৫৩২ মাইল লম্বা হবে, যেখানে প্লেটো, নিউটন, শেকসপিয়রের মতো প্রতিভাধরদের লেখা বই-ই শুধু নয়, রয়েছে তাঁদের পূর্ণ অবয়ব মূর্তি সারি-সারি সাজানো, সেই লাইব্রেরির নাম 'দি লাইব্রেরি অব কংগ্রেস'। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি· সি·-তে 'ক্যাপিটল' প্রাসাদের কাছাকাছি একটা পাড়া জুড়ে তিন-তিনটি অতিকায় বাড়িতে তার চলেছে বিস্ময়কর কর্মযজ্ঞ।

ওয়াশিংটন ডি· সি·-র কেন্দ্রস্থলেই ক্যাপিটল প্রাসাদ, আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র। তারই কাছে সদা চঞ্চল ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাভিনিউ ও ফার্স্ট স্ট্রিটের সংযোগস্থলে একটা পুরো ব্লক অর্থাৎ পিছনে সেকেন্ড স্ট্রিট পর্যন্ত জায়গা জুড়ে বিশাল টমাস জেফারসন বিল্ডিং। পাশাপাশি, ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাভিনিউয়ের অন্য ফুটপাথে ম্যাডিসন মেমোরিয়াল বিল্ডিং। আর জেফারসন বিল্ডিংয়ের পিছনে, সেকেন্ড স্ট্রিটের অন্যদিকের ফুটপাথে জন অ্যাডামস বিল্ডিং। উপরের রাস্তা দিয়েও এই পাশাপাশি তিনটি বাড়িতে যাওয়া যায়, কিন্তু বাস ও গাড়ির অবিশ্রাম স্রোত এবং নিরন্তর পথচলতি মানুষের ভিড় এড়িয়ে অবাধ গতিতে তিনটি বাড়ির মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তার তলা দিয়েও সুড়ঙ্গ-পথে তিনটি বাড়ি পরস্পর যুক্ত। সেই সুড়ঙ্গ-পথে দিনরাত সব সময়ে আলো জ্বলছে, পড়ুয়ারা এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়িতে যাচ্ছেন, শুধু তাই নয়, বইভর্তি ছোট আকারের মোটর ট্রাকও এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যেতে দেখেছি।

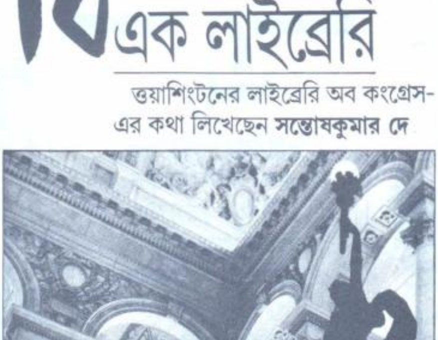

স্থাপত্যের দিক থেকেও এই লাইব্রেরি এক অতুলনীয় কীর্তি

এই তিনটি বৃহৎ বাড়ি ছাড়াও অন্যত্র এই লাইব্রেরির কর্মকেন্দ্র আছে। এই তিনটি বাড়ির মধ্যে জেফারসন বিল্ডিংটি বয়সে সবচেয়ে পুরনো হলেও অতি সুন্দরভাবে সাজানো। ইতালির স্থাপত্যরীতির এই মর্মর প্রাসাদ তৈরি করতে দীর্ঘ আট বছর সময় লেগেছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এটির কাজ শেষ হয়। পঞ্চাশজন আমেরিকার সেরা ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী কয়েক বছর ধরে এর অতুলনীয় শিল্পসম্ভার সৃষ্টি করেন।

জেফারসন বিল্ডিং-এ সবচেয়ে বড় যে পড়বার ঘরটি আছে, তা তিন তলার দর্শক-গ্যালারি থেকে অপূর্ব দেখায়। মেজে থেকে গম্বুজ অবধি পাথরের স্তম্ভগুলি ১৬০ ফুট উঁচু। শুধু এই একটি হলেই ৪৫০০০ রেফারেন্স বই আছে। তা ছাড়া গোটা লাইব্রেরির ২ কোটি ৩০ লক্ষ রেফারেন্স কার্ডের এক অংশও এখানে আছে। ২১২ জন পাঠক একসঙ্গে বসে পড়তে পারেন এই একটি হলঘরে। এটি ছাড়া আরও পড়বার ঘর আছে। প্রতিটি ডেস্কে পৃথক আলো, আরামদায়ক চেয়ার। এত পাঠকের ভিড় কিন্তু গোটা হলঘর নিস্তব্ধ। পাশেই কম্পিউটার ক্যাটালগ সেন্টার, সেখানে দলে-দলে লোক কম্পিউটার টারমিনালে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিচ্ছেন।

বারান্দায় রয়েছে বসন্ত ঋতুর এই ছবি

জেফারসন বিল্ডিং-এ লাইব্রেরির স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় এই বাড়ির পিছনে, রাস্তার অন্য পারে তৈরি হয় জন অ্যাডামস বিল্ডিং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। সেটি জেফারসন বিল্ডিং-এর মতো অত জাঁকজমকপূর্ণ না হলেও বাড়ির সামনের দিক সুন্দর সাদা মার্বেল পাথরে মোড়া আর তার প্রধান প্রবেশপথে ব্রোঞ্জের বিরাট দরজাগুলিতে

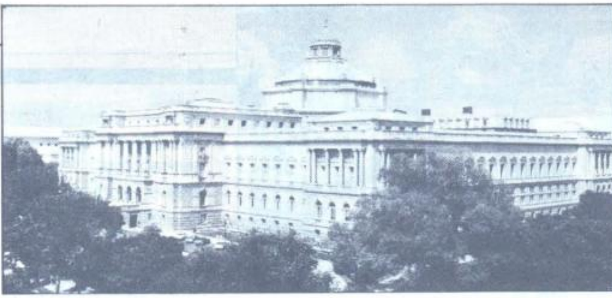

এই সেই লাইব্রেরি অব কংগ্রেস

আছে পর-পর বারোটি মনুষ্য-মূর্তি । এই চমৎকার মূর্তি সেইসব ঐতিহাসিক পুরুষদের, যাঁরা পৃথিবীর নানা দেশের লেখার হরফ আবিষ্কার করেছিলেন ।

এখানেও যখন লাইব্রেরির স্থান সঙ্কুলান হল না তখন তৈরি করতে হয় আরও একটি বাড়ি । জেফারসন বিল্ডিং-এর পাশাপাশি ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাভিনিউ-এর অন্য দিকে সেই নতুন বাড়ি জেমস ম্যাডিসন মেমোরিয়াল বিল্ডিং, ১৯৮০ সালে তৈরি হয়েছে । যার ফলে গোটা লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের স্থান-পরিধি দ্বিগুণ হয়ে গেছে ।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে মোট আট কোটি বই, ম্যাপ, ফোটো প্রভৃতি সংগৃহীত আছে । সভ্যতার আদি পর্ব থেকে একেবারে হালের লেখা ও পড়ার যাবতীয় উপকরণ (যেমন আদিম প্যাপিরাস থেকে অতি আধুনিক মাইক্রোফিল্ম, যাতে বড়-বড় বইয়ের পাতা ছোট-ছোট ফোটোতে ধরে রাখা যায়) এই লাইব্রেরিতে বৈজ্ঞানিক নিয়মে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা আছে, যাতে যার যখনই যে জিনিসটি দরকার তা পেতে পারে ।

এইসব জিনিস গুছিয়ে রাখতে যতগুলি তাক তৈরি করতে হয়েছে, তা যদি পাশাপাশি রাখা যায় তা হবে ৫৩২ মাইল লম্বা । আর এই সংগ্রহ তো থেমে নেই । প্রতি মিনিটে গড়ে ১০টি বিষয় সংগ্রহ করা চলছে, অর্থাৎ, দৈনিক গড়ে চোদ্দ হাজারেরও বেশি বস্তু সংগৃহীত হয় । সেজন্যই লাইব্রেরির জায়গা দ্বিগুণ করতে হয়েছে ।

এই লাইব্রেরিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ষাটটি ভাষার দেড় কোটি বই ও পুস্তিকা আছে, আর আছে সাড়ে তিন কোটি পাণ্ডুলিপি, পুঁথিপত্র, যার মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের কাগজপত্র, বিখ্যাত লেখক ও শিল্পীদের পাণ্ডুলিপি ও চিত্র এবং বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের খসড়াও আছে ।

এ ছাড়া এখানে আছে চল্লিশ লক্ষ ম্যাপ, অ্যাটলাস, খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে একেবারে হাল আমলের । আর আছে ষাট লক্ষ গানের স্বরলিপি, চিঠিপত্র, বাদ্যযন্ত্র, রেকর্ড, টেপ, ক্যাসেট ইত্যাদি । আছে এক কোটি ঐতিহাসিক ফোটো, ছবি । বারোশো খবরের কাগজের নিয়মিত সংখ্যাগুলির ফাইল । আড়াই লক্ষ ফিলমও সংগৃহীত আছে । এই সব-কিছুই নিয়মিতভাবে ভাগে ভাগে প্রদর্শিত হয়ে থাকে । তা ছাড়া স্থায়ীভাবে দেখানো হয় লাইব্রেরির অমূল্য সংগ্রহ দুটি বাইবেল—গুটেনবার্গের ছাপা বাইবেল, সারা পৃথিবীতে যার মাত্র তিনটি কপি আছে । আর মেইনজ-এর হাতে-আঁকা ছবিসহ বিরাট আকারের বাইবেল—যার বয়স গুটেনবার্গের বাইবেলের সমান ।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের উপর দায়িত্ব রয়েছে সারা আমেরিকায় যেখানে যত বই প্রকাশিত হয় তার 'গ্রন্থস্বত্ব' বা 'কপি রাইট'

এই লাইব্রেরিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ষাটটি ভাষায় দেড় কোটি বই ও পুস্তিকা আছে, আর আছে সাড়ে তিন কোটি পাণ্ডুলিপি, পুঁথিপত্র, যার মধ্যে বিখ্যাত লেখক ও শিল্পীদের পাণ্ডুলিপি ও চিত্র আছে ।

লাইব্রেরির প্রবেশপথের উত্তর দিকের বারান্দার একাংশ

হেরোডোটাসের এই মূর্তি ইতিহাসের প্রতীক

আইনশাস্ত্রের প্রতীক কেন্ট-এর এই মূর্তি

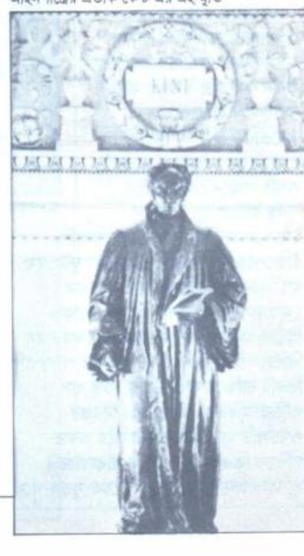

অনুমোদন করবার।

এই লাইব্রেরি থেকেই সমস্ত নতুন বইয়ের ক্যাটালগ প্রকাশিত হয় এবং দেশের অন্যান্য লাইব্রেরিতে সরবরাহ করা হয়।

বড়দিনের ছুটি আর ১ জানুয়ারির ছুটি ছাড়া বছরের আর সব দিনেই এই লাইব্রেরি খোলা থাকে। পড়বার ঘর, প্রদর্শনী, ফিল্ম শো, এমনকী,সারা লাইব্রেরি ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থাও প্রতি দিনই চলতে থাকে। 'Calendar of Events' নামে তার ছাপা বিবরণীও প্রকাশিত হয়। লাইব্রেরির মধ্যেই বিশ্রাম করবার ঘর বা জলযোগ সারবার

রবার্ট ফুলটনের এই মূর্তি বাণিজ্য শাস্ত্রের প্রতীক

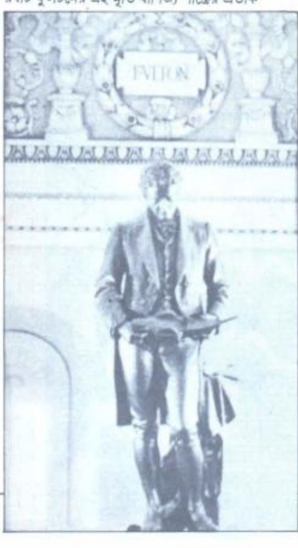

দেশ-বিদেশের সেরা লাইব্রেরি : বইয়ের সংগ্রহ

মস্কোর লেনিন লাইব্রেরি	আড়াই কোটি
আমেরিকার লাইব্রেরি অব কংগ্রেস	দেড় কোটি
ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি	পঁচাশি লক্ষ
ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার	বাইশ লক্ষ

কাফেটেরিয়া পর্যন্ত রয়েছে।

বই পড়বার সময় না পেলে শুধু জেফারসন বিল্ডিং-এর সিঁড়ি, গ্যালারি, প্রদর্শনী, চিত্রশালা—এইসব খুঁটিয়ে দেখলেও বহু তথ্য জানা যায়। কেনা যায় সেসব বিষয়ের প্রয়োজনীয় বই, -লাইব্রেরির নিজস্ব বিক্রয় বিভাগে। তারপর দেখেশুনে নিজের প্রয়োজনের বিশেষ বিষয়টি নিয়ে কত পড়তে চাও পড়ো। সে-পড়ার সুবিধার জন্য নানারকম ব্যবস্থা আছে। কম্পিউটারের সাহায্য নিতে পারো, যা জানতে চাও তার হদিস মুহূর্তে ফুটে উঠবে কম্পিউটারের পরদায়। ধরো, তোমার মনে পড়ছে না রবীন্দ্রনাথ কোন বছরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার জন্য তাঁর জীবনীগ্রন্থ হাতড়াবার দরকার নেই, কম্পিউটারই জানিয়ে দেবে সংক্ষেপে কবির জীবনী। তুমি যদি জানতে চাও, চাঁদে যেদিন মানুষ প্রথম পা ফেলল সেদিনের খবর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' কাগজে কীভাবে বেরিয়েছিল। গোটা নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকাখানির প্রতিটি পৃষ্ঠার মাইক্রোফিল্ম প্রতিদিন করা হয়।

এই লাইব্রেরি নিয়মিতভাবে নানা ডকুমেনটারি ফিল্ম দেখায়, গানবাজনা শোনায়, যার যেদিকে আগ্রহ সে সেইদিকের সুবিধাগুলি ভোগ করে। আজকের এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান লাইব্রেরি অব কংগ্রেস একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর বয়স বলতে গেলে ১৯০ বছর। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন কেবল কংগ্রেসের ব্যবহারের জন্য মাত্র পাঁচ হাজার ডলার ব্যয়ে একটি ছোট লাইব্রেরি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। সেই অর্থে ইংল্যান্ড থেকে এগারো ট্রাঙ্ক ভর্তি বই আর এক ট্রাঙ্ক ম্যাপ এনে ক্যাপিটল প্রাসাদের যেটুকু অংশ তখন তৈরি হয়েছিল তারই একপাশে ছোট আকারের লাইব্রেরিটি স্থাপিত হয়। প্রথমে শুধু কংগ্রেসের লোকদের ব্যবহারের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, নামও রাখা হয়েছিল দি লাইব্রেরি অব কংগ্রেস। কালক্রমে তার আকৃতি ও প্রকৃতি যেমন বেড়েছে তেমনই তার দরজা খুলে ধরা হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য।

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সৈন্য তাদের মার্কিন উপনিবেশ রক্ষার চেষ্টায় ওয়াশিংটনে এসে ক্যাপিটল প্রাসাদে কেন্দ্রীয় সরকারের মূল দফতরটি অধিকার করে এবং লাইব্রেরি অব কংগ্রেস সম্পূর্ণ পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবার সেই পুড়ে যাওয়া লাইব্রেরি নতুন করে গড়ে তোলা হয়। প্রেসিডেন্ট জেফারসন তখন অবসর

লাইব্রেরির পাঠকক্ষের একাংশ

নিয়ে মনটিচেলোতে বাস করতেন। তিনি যখন ফ্রান্সে মার্কিন-রাষ্ট্রদূত ছিলেন তখন সেখানকার দোকানে ঘুরে-ঘুরে আমেরিকা সম্পর্কে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে এনে নিজের লাইব্রেরিতে রেখেছিলেন। তিনি কংগ্রেসকে জানালেন, তাঁরা যে দাম দিতে পারবেন তাতেই তিনি ওইসব অমূল্য গ্রন্থ লাইব্রেরিকে দেবেন। কংগ্রেস মাত্র ২৩,৯৫০ ডলারে একসঙ্গে বাছাই করা ৬৪৮৭ খানা বই জেফারসনের কাছ থেকে এনে নতুন করে লাইব্রেরি অব কংগ্রেস গড়ে তোলেন। ক্রমে গ্রন্থসংখ্যা বাড়লে ক্যাপিটল বাড়ির সেই অংশে জায়গা না হওয়ায় লাইব্রেরির নিজস্ব বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে জেফারসন বিল্ডিং তৈরি শেষ হয়। ৫০ জন সুনির্বাচিত স্থপতি, ভাস্কর ও চিত্রকর লাইব্রেরি-বাড়িটি নিখুঁত ও পরিপাটি করে, শিল্পমণ্ডিত করে তোলেন। অন্য বাড়ি দুটি পরে তৈরি হয়।

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে

কানে শোনার যন্ত্রে রিমোট কন্ট্রোল

বছর তিরিশ আগে চোখে চশমা নেওয়ার ব্যাপারে অনেকেরই তেমন আগ্রহ ছিল না। পরে চশমা চোখে দেওয়াটা নেহাতই স্বাভাবিক বলে সকলে মেনে নিয়েছে।
কানে শোনার যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখন ঠিক সেইরকম অবস্থা। অর্থাৎ, ওই যন্ত্র ব্যবহার করে কোনও ব্যবহারকারী সকলকে জানান দিতে চান না যে, তিনি কানে খাটো। অথচ যাঁরা কানে কম শোনেন, এই যন্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া তাঁদের আর উপায় কী। সুতরাং ব্যবহারকারীর 'অস্বস্তির' কথা মনে রেখে বছর দুয়েক আগে পশ্চিম জার্মানির সিমেন্স কম্পানি 'টেলোস' নামে একটি আলট্রাসনিক রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট তৈরি করেছিল। কানে শোনার যন্ত্রের রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রথম। এই ইউনিটটি পকেটে রেখেই ব্যবহারকারী তাঁর কানে লাগানো হিয়ারিং এইড যন্ত্রের শব্দগ্রাহিতা নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

রিচার্জেব্‌ল্ পেসমেকার

পেসমেকারের কাজ হল হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করা। যাঁদের হৃদযন্ত্রের ক্ষমতা কমে এসেছে, তাঁদের ব্যবহার করতে হয় পেসমেকার। তবে একটা পেসমেকারের নির্দিষ্ট আয়ু রয়েছে। ব্যাটারি-শক্তি চালিত এই খুদে ইলেকট্রনিক যন্ত্রটির ব্যাটারি বদল করতে হয় কয়েক বছর পর-পরই। কোনও-কোনও ধরনের পেসমেকার একবার রুগির শরীরে বসালে প্রায় সাত -আট বছর নিশ্চিন্ত। তবে বোঝাই যাচ্ছে, পেসমেকার বসানো অথবা তার ব্যাটারি বদল, সব ক্ষেত্রেই অপারেশন করতে হয় রুগির শরীরে। প্রথম পেসমেকার বসানো হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। তারপর অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞান। ফলে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে রিচার্জেবল পেসমেকার। এর ব্যাটারি বদলের কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু ব্যাটারির ক্ষমতা কমে এলেই তাকে আবার নতুন করে চার্জ করে দিতে হয়। আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি অতি খুদে নিকেল-ক্যাডমিয়াম ব্যাটারির জন্যই এই রিচার্জেবল পেসমেকার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

প্লাস্টার-করা হাত চুলকোতে হলে

ক্যালিফোর্নিয়ার দুই বিখ্যাত মোটর সাইকেল-আরোহী লেনি ফাস ও বিল স্পেথ। মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে দুজনে হাড় ভেঙেছেন অন্তত কয়েক ডজন বার। গত বছরে প্রাতরাশের টেবিলে বসে গল্প করছিলেন ফাস ও স্পেথ। কথায়-কথায় হাড়গোড় ভাঙা, প্লাস্টার ইত্যাদির আলোচনা শুরু হল। শরীরের কোনও জায়গা প্লাস্টার করার পর সে-জায়গাটা যখন চুলকোয় তখন কী অসহ্য অবস্থাই না হয়! তা ছাড়া প্লাস্টারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দুর্গন্ধ তো আছেই! স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে ফাস বলেছেন, 'এই দুটো ব্যাপার সামলাতে গিয়ে যতরকম চেষ্টা আমরা করেছি সব কাগজে লিখে ফেললাম। তারপর সমস্যাটা নিয়ে গেলাম একজন কেমিস্টের কাছে। তিনি বললেন যে, চুলকুনির কারণ হল প্লাস্টারের ভেতরে জন্মানো এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া। আর দুর্গন্ধের কারণ জলীয় বাষ্প, গরম ও বাতাস চলাচলের অসুবিধে।'

তখন ওরা দুজনে অ্যালকোহল ও ট্যালকম পাউডার মিশিয়ে একটা এয়ারোসল তৈরি করলেন। এই তরলটিকে সরু একটি নলের সাহায্যে প্লাস্টারের ভেতরে স্প্রে করা সম্ভব। অ্যালকোহল দ্রুত উবে যায়। সুতরাং সেখানে পড়ে থাকে শুধুই ট্যালকম পাউডার। এই পাউডার জলীয় বাষ্প শুষে নেয়, ফলে দুর্গন্ধ ও চুলকুনি—দুই-ই কমে যায়। ফাস ও স্পেথ এই এয়ারোসল টোট্‌কার নাম দিয়েছেন 'কাস্টব্লাস্ট'।

হাইড্রা দানব ও হারকিউলিস

গ্রিক পুরাণের গল্পে পাওয়া যায় হাইড্রা ও হারকিউলিসের কাহিনী। সহস্র-মস্তক এক দানব ছিল হাইড্রা। জলাশয়ে বাস করত সে। তার আতঙ্কে অস্থির ছিল স্থানীয় মানুষ। তখন বীর নায়ক হারকিউলিস এলেন হাইড্রাকে খতম করতে। কিন্তু দানবের একটা মাথা কাটলেই সে-জায়গায় গজিয়ে ওঠে দু-দুটো মাথা। তখন হারকিউলিস দানবের প্রধান মাথাটি ছাড়া আর

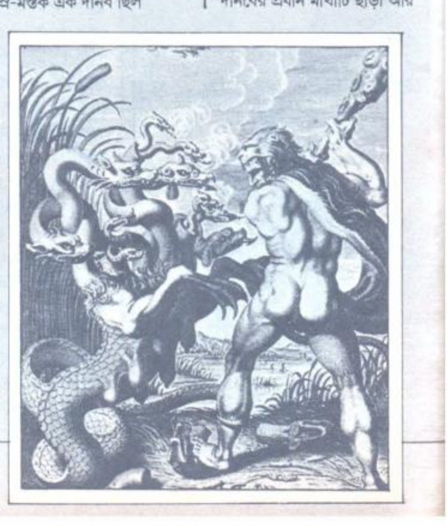

ডাইনোসরদের যাতায়াতের পথ

আজ থেকে দশ কোটি বছর আগে ডাইনোসরেরা যখন পৃথিবীর বুকে রাজত্ব চালাত তখন বর্তমান আমেরিকান মিডওয়েস্ট অঞ্চলের পুরোটাই ছিল সমুদ্র। কোলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ মার্টিন লকলি-র মতে সেই সমুদ্রের পশ্চিম পাড় ছিল ডাইনোসরদের পরিযাণের পথ। রকি মাউন্টেন-এর পুব ঢাল বরাবর পাথরে কয়েকশো বর্গমাইল এলাকা জুড়ে পাওয়া গেছে 'দৈত্যাকার পথ'-এর চিহ্ন। এটাই লকলির অনুমানের ভিত। বিজ্ঞানীদের মতে, ইগুয়ানোডোন্টিডস ও অন্যান্য জাতের ডাইনোসরেরা মিলে এরকম কোটি কোটি চলাচলের পথ সৃষ্টি করেছে। এই পথগুলোর বেশির ভাগই উত্তর থেকে দক্ষিণ বরাবর— উত্তর কোলোরাডো থেকে উত্তর নিউ মেক্সিকো পর্যন্ত। এটাই ছিল প্রাচীন সমুদ্রের পশ্চিম

তীর।

ডাইনোসরেরা কেন পরিযায়ী ছিল, সে-বিষয়ে লক্‌লি এখনও নিশ্চিত নন। তবে তাঁর ধারণা, পরিযায়ী অন্য পশুরা যে কারণে পরিযাণে বাধ্য হয় ডাইনোসরদের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই হয়েছিল। অর্থাৎ, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাকৃতিক খাবারের জোগান উত্তর-দক্ষিণে সরে যেত। ফলে বেচারি ডাইনোসরদের উত্তর-দক্ষিণে যাতায়াত করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। আর তাতেই তৈরি হয়েছে ওই দৈত্যাকার পথ।

সব ক'টা মাথাই পুড়িয়ে ফেললেন। প্রধান মাথাটি ছিল অমর। সেটাকে হারকিউলিস চিরকালের মতো পুঁতে দিয়েছিলেন প্রকাণ্ড এক পাথরের নীচে।

সম্প্রতি দক্ষিণ গ্রিসের এক ভূতত্ত্ববিদ এবারহার্ড জ্যাংগার দাবি করেছেন যে, এই কাহিনীর রহস্য তিনি ভেদ করেছেন। পৌরাণিক দানব হাইড্রার বাস ছিল প্রকাণ্ড হ্রদ লার্নায়। জ্যাংগার তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা করছিলেন লার্না হ্রদকে নিয়েই। ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলে তিনি জেনেছেন এককালে লার্নারের অনেক খাল ছিল। সেই খালগুলোর দুকূল ছাপিয়ে নিয়মিত বন্যা হত।

বর্তমানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ অ্যাসোশিয়েট জ্যাংগার বলেছেন, 'স্থানীয় অধিবাসীরা একটা খাল বুজিয়ে ফেলার পর লক্ষ করত যে, আর-একটা নতুন খাল তৈরি হয়ে গেছে। সম্ভবত এ-থেকেই সহস্র-মস্তক হাইড্রা দানব ও হারকিউলিসের লড়াইয়ের পৌরাণিক কাহিনীটির জন্ম।'

ক্লান্ত পেশি চাঙ্গা করতে শব্দের ব্যবহার

নাম নোভাফোন সনিক ম্যাসেজার। ক্লান্ত পেশির মধ্যে ঠিকমতো রক্তসঞ্চালনের জন্য এবং পেশিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য এই ম্যাসেজারের জুড়ি নেই। পশ্চিম জার্মানির এই যন্ত্র ইউরোপের প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ ব্যবহার করে। ব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছেন ক্রীড়াপ্রশিক্ষক, চিকিৎসক, ফিজিওথেরাপিস্ট ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। নোভাফোন সনিক ম্যাসেজার থেকে নির্গত মিশ্র কম্পাঙ্কের শব্দ ত্বকের সোয়া দু' ইঞ্চি গভীরে প্রবেশ করে পেশি সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার কাজ করে। এই শব্দের মধ্যে দশ হাজার হার্ৎজ পর্যন্ত নানা কম্পাঙ্কের শব্দ রয়েছে। যন্ত্রটিতে চলমান কোনও অংশ নেই, ফলে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা অনেক কম। আট আউন্স ওজনের এই যন্ত্রটির সঙ্গে রয়েছে ছ' ফুট লম্বা মেইন্সকর্ড, দুটি ভিন্ন আকারের হেড এবং সুদৃশ্য কেস। এক বছরের গ্যারান্টিযুক্ত নোভাফোন সনিক ম্যাসেজার-এর দাম একশো ষাট ডলার।

নতুন যুগের অ্যান্টেনা

সোয়া সতেরো ইঞ্চি উচ্চতার এই ঘরোয়া অ্যান্টেনা বেতার-সঙ্কেত গ্রহণে যথেষ্ট পারদর্শী। ক্ষীণ হয়ে আসা বেতার-সঙ্কেতকে জোরালো করে তুলতে বা সঙ্কেতে উপস্থিত অপস্বর অপসারণের কাজে নতুন এই অ্যান্টেনা এল-এস-ফোর রীতিমত দক্ষ। এর ভেতরে রয়েছে সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক বর্তনি আর তার প্রাণ একটি মাইক্রোচিপ। প্রেরিত বেতার-সঙ্কেত গ্রহণের পর এল-এস-ফোর তাকে নিখুঁতভাবে

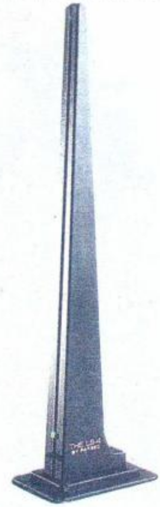

বিভিন্ন কম্পাঙ্কে ভাগ করে ফেলে। এই কাজে সাহায্য করার জন্য রয়েছে গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর। এল-এস-ফোর যে-কোনও দিক থেকে আসা বেতার-সঙ্কেত গ্রহণ করতে পারে।

যে ছুরির ধার নষ্ট হয় না

শুনে অসম্ভব মনে হলেও এই ঘটনা সম্ভব করে তুলেছে মার্কিন মুলুকের রিজেন্ট শেফিল্ড কম্পানি। রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য পাঁচটি ছুরির একটি সেট তৈরি করেছে তারা। নাম : লেসার-২০০০। এই ছুরি পঁচিশ বছর একটানা ব্যবহার করা যাবে একটুও ধার না দিয়ে। যদি কোনও কারণে পঁচিশ বছরের মধ্যে ছুরির ধার নষ্ট হয়ে যায়, ছুরিতে মরচে পড়ে, বা ভেঙে যায় তা হলে কম্পানি বিনামূল্যে সেই ছুরি পালটে দেবে। লেসার-প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি এই ছুরির ওপরে রয়েছে জাইলান নামে পলিস্যাকারাইডের প্রলেপ। এর ফলে শক্ত তরিতরকারিও চটপট কেটে ফেলা যায়।

প্রচ্ছদকাহিনী

বীর

কামাকুরা আমলের বর্ম

সামুরাই

সাহস ও রণকৌশলের জন্য জাপানের সামুরাইরা বিখ্যাত। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই সামুরাইদের কথা লিখেছেন শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

কামিও মারু ও আরিও মারুর যুদ্ধ (আনুমানিক ১৮৪৫-এর চিত্র)

জাপানের মাত্সুওমারু যোদ্ধা (আনুমানিক ১৮৩৬-এর চিত্র)

কুঁড়েঘরের মধ্যে খোলা দরজার সামনে বসে আছেন এক প্রৌঢ় সামুরাই। বাইরে কিছু লোকজন। প্রৌঢ়টি ওদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। তাঁর কয়েকজন তরুণ স্বেচ্ছাসেবক দরকার। গ্রামের মানুষদের বাঁচাতে হবে। ডাকাতের বড় উৎপাত। দরিদ্র, দুর্বল গ্রামবাসীরা তাঁর সাহায্য চেয়েছে। তাই এই ব্যবস্থা। ক'জন সাহসী, বীর সামুরাই পেলেই তিনি হটিয়ে দিতে পারবেন ডাকাতদলকে। কিন্তু আসল সামুরাই মিলছে না কিছুতেই।

পরীক্ষাটা কী?

খোলা দরজার পাল্লার আড়ালে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে লাঠি হাতে। একজন করে পরীক্ষার্থী ঢুকলেই লাঠির আঘাত। যে আচমকা এই লাঠির আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে, বোঝা যাবে সে সচেতন ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন। এটা একজন সামুরাইয়ের অন্যতম পরিচয়।

ঢুকল একজন। প্রৌঢ়টি স্থির তাকিয়ে আছেন তার দিকে। পেছন থেকে লোকটির মাথার ওপর লাঠি নেমে এল। আর

সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড আঘাত উপেক্ষা করে সেও ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটিকে মাটিতে আছড়ে ফেলল। তারপর বুক ফুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল প্রৌঢ়ের দিকে। ভাবখানা এই, "কী, পরিচয়টা পেলে তো, আমি সত্যি-সত্যি সামুরাই কি না?"

কিন্তু ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন প্রৌঢ়, "না, তুমি পাশ করোনি।"

লোকটি অবাক হল, "কেন?"

প্রৌঢ় হেসে উত্তর দিলেন, "একজন প্রকৃত সামুরাইয়ের সজাগ দৃষ্টিশক্তিও তার আর-এক পরিচয়। ঘরে ঢোকার আগে তোমার খেয়াল করা উচিত ছিল যে, কারও ছায়া পড়েছে মাটির ওপর। অর্থাৎ, দরজার পাশে কেউ লুকিয়ে আছে। একজন প্রকৃত সামুরাই তা দেখামাত্রই সঙ্গে-সঙ্গে তৎপর হয়ে যেত। ঘরে ঢোকার অন্য উপায় অবলম্বন করত, যাতে কোনওরকম বিপদের আশঙ্কা না থাকে।" লোকটি মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।

কুরোসায়ার বিখ্যাত ছবি 'সেভেন সামুরাই'-এর এই বিশেষ দৃশ্যটি একজন সামুরাই সম্পর্কে অনেক কথাই আমাদের জানিয়ে দেয়।

'সামুরাই' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ, 'যিনি কর্তব্য পালন করেন।' এঁদের আর-একটি স্বল্প প্রচলিত নাম আছে—'বুশি'। অর্থাৎ 'যোদ্ধৃজাতি'। প্রাগাধুনিক জাপানের (দশম শতাব্দী) রাজ্যগুলিতে এরা বিচ্ছিন্নভাবে জেগে ওঠে এবং যোদ্ধৃজাতি থেকে এক শক্তিশালী শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত হয় দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ—অর্থাৎ মধ্যযুগের গোড়ার দিকে। এদের শাসনকাল চলতে থাকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, যতদিন না মেইজি স্থিতি-পর্বের সূচনা হয় (১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ)। গোষ্ঠী হিসেবে সামুরাইদের গরিমা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ মুছে যায় ১৮৭০-এর মাঝামাঝি। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে আধুনিক জাপানের সরকারি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে যান অনেক

তরোয়ালকে বলা হত সামুরাইদের 'আত্মা'

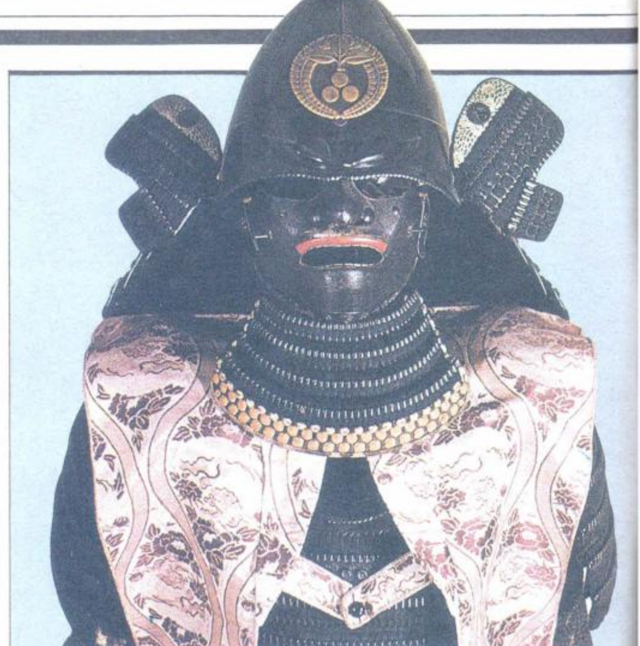

সামুরাইদের বর্মের ছিল নিজস্ব ধারা

সামুরাইদের অস্ত্র ও বর্ম

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্বে টোয়োটোমি হিদেয়োশির নির্দেশে সামুরাই ছাড়া অন্য সবারই অস্ত্র রাখার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। টোকুগাওয়া শোগানেট-এর সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অধিকারও সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হল। শুধু সামুরাইরা দুটি করে তরোয়াল কাছে রাখতে পারতেন। হেইয়ান শাসনপর্বের আগে সামুরাইরা এক বিশেষ ধরনের তরোয়াল ব্যবহার করতেন। এদের বলা হত 'টাচি'। টাচির ফলক ছিল লম্বা এবং সোজা। ফলকের গায়ে রুপোর খোদাই করা চিনা

সামুরাই-শিরস্ত্রাণ

পুঁথির কথা লেখা থাকত।
হেইয়ান শাসনকালের মাঝামাঝি টাচির ফলক বাঁকানো চেহারা নেয়।
মারোমাচিদের রাজত্বের সময় থেকে ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধ কমতে শুরু করে। অধিকাংশ সামুরাই হয়ে যায় পদাতিক এবং মুখোমুখি লড়াইয়ের আসর জমে ওঠে। ফলে, টাচির দৈর্ঘ্য বাধ্য হয়ে কিছুটা কমানো হয়। কারণ, অত লম্বা এক একটা তরোয়াল খাপ থেকে বের করে শত্রুকে আক্রমণ করতে গেলে নিজের বিপদের আশঙ্কা থেকে যেত। তাই, এই ধরনের ছোট তরোয়াল বা 'কাটানা'র ব্যবহার বাড়ল।
আগেকার টাচির চেয়ে আধুনিক কাটানা ওজনেও বেশ ভারী ছিল। সামান্য আঘাতেও তাই ফল হত মোক্ষম। কাটানার ফলকের গায়ে থাকত কর্মকারদের স্বাক্ষর।
কাটানা ছাড়াও সামুরাইদের কোমরে ঝুলত বিশেষ আর-এক ধরনের তরোয়াল। লম্বায় ছিল প্রায় দু' ফুট। এদের বলা হত 'ওয়াকি জাশি'। আর এই দু'টি তরোয়ালকে একসঙ্গে ডাকা হত 'দাইশো' বলে—'লম্বা আর বেঁটে।' এদেরও হাতল এবং খাপের ওপর থাকত সুন্দর কারুকার্য।
তরোয়াল ছাড়াও সামুরাইরা ব্যবহার করতেন অনেকটা একই ধরনের অস্ত্র—'নাগিনাটা' বা 'নাগামাকি'। লম্বা কাঠের হাতলের মাথায় বাঁকানো লোহার ফলক বসানো। এদের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হত কামাকুরা রাজত্বকালে।
দশম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সামুরাইরা দু' ধরনের বর্শা ব্যবহার করতেন—'হোকো' এবং 'ইয়ারি'। দ্বিতীয়টিই অবশ্য বেশি চলত চতুর্দশ শতাব্দীর পর। এর অনেক পরে, প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, সামুরাইদের হাতে দেখা দিল এক অদ্ভুত ধরনের বর্শা—লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ' ফুট। প্রথমদিকে ফলকগুলোর তিনকোনা আকার থাকলেও পরে দু'মুখো চেহারা নেয়। ফলকের মাথার দিকে চিরে গিয়ে দুটো কোণ থাকত। তা ছাড়া ফলকের দু'পাশেও যথেষ্ট ধার ছিল। প্রয়োজন হলে তরোয়ালের মতোও ব্যবহার করা যেত এই অস্ত্র।
পোর্তুগিজদের জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের

সামুরাই-বর্ম

সঙ্গে পরিচিত হন সামুরাইরা। উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা তা গ্রহণ করেন। তাঁদের যুদ্ধধারার মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে যায় তারপর। কিন্তু ওইটুকুই। কারণ, টোকুগাওয়া শোগানেটের সময়ে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করার নির্দেশ জারি হওয়ার ফলে তাঁরা এ-ব্যাপারে আর কোনও উন্নতি ঘটাতে পারেননি। তাই, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও সামুরাইরা শুধু পুরনো দিনের আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। ততদিনে পশ্চিমের দুনিয়ায় এই অস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ঘটে গেছে। যা কিছু পরিবর্তন হল, সবই তাই বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মেইজি স্থিতিপর্বে। কামানের ক্ষেত্রেও (ওজুৎসু বা তাইহো) সেই একই কথা বলা যেতে পারে।
বর্মের ক্ষেত্রে সামুরাইরা পুরোপুরি নিজস্ব ধারা অর্জন করেছিলেন। পাশ্চাত্যের বর্মের মতো তাঁদের বর্ম শুধু সাদামাটা ভারী ধাতুর তৈরি ছিল না। নিজেদের গোষ্ঠীর ঐতিহ্য বোঝাতে সামুরাইরা পরতেন উজ্জ্বল রঙের বর্ম। অবশ্য ভাবলে ভুল হবে যে, এগুলোর ব্যবহারিক উৎকর্ষ কম ছিল। যেদিন থেকে সামুরাইদের মধ্যে বাঁকানো ফলার তরোয়ালের প্রচলন শুরু হল, প্রায় সেদিন থেকেই তাঁদের বর্মের ক্ষেত্রেও ঘটল রূপান্তর। এক বিশেষ ধরনের বর্ম দেখা দিল—'ওয়োরয়'। এদের সাজানো হত সোনা-রুপোর অলঙ্কার দিয়ে এবং এক-একটা অংশ আটকানো থাকত রঙিন দড়ির সাহায্যে। ওয়োরয় বর্ম আসলে 'কিকো' বর্মের উন্নত রূপ। অশ্বারোহী তীরন্দাজদের মধ্যেই এই বর্মের প্রচলন ছিল বেশি। ওয়োরয় বর্মের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম।
সামুরাইদের বুক, পিঠ ও পাঁজরের বাঁ দিকে 'কাবুকিডো' প্লেট দিয়ে ঢাকা থাকত। ডান দিকের পাঁজরের ওপর থাকত আর-একটি প্লেট—'ওয়েইদাতে।' উরুর ওপর থাকত 'কুসাজুরি'—আলাদা আলাদা প্লেট—কোমর থেকে বাঁধা অবস্থায় ঝুলত। বুকের ওপরের অংশের ডান দিকে থাকত 'সেনডান নো ইটা', আর বাঁদিকে 'কুযুবি নো ইটা' নামের দু'টি আলাদা বর্ম।
এ ছাড়া ছিল লোহার তৈরি শিরস্ত্রাণ—'হোসিকাবুতো'। শিরস্ত্রাণের ওপর শিংয়ের মতো অনেক সময় উঠে থাকত একজোড়া লোহার শিক—'কুয়াগাতা'।

সামুরাই।

ইতিহাসের পাতায় ৯৩০ সালের শেষের দিকে জাপানে সর্বপ্রথম একটি বিশেষ যোদ্ধজাতির খোঁজ পাওয়া যায়। সেই সময়ে কান্টো এলাকায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। যদিও মধ্য-পূর্ব হনশু'র কান্টো এলাকাকেই সামুরাইদের জন্মভূমি বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে, আরও আগে, অর্থাৎ চতুর্থ এবং সপ্তম শতাব্দীর জাপানের অন্যান্য জায়গাতেও এদের হদিস মিলেছে। তবে হেইয়ান শাসনপর্বেই সামুরাইরা সর্বপ্রথম একটি ক্ষমতাবান যোদ্ধজাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন।

সামুরাইদের হঠাৎ এতখানি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমেই বলতে হয় কিয়োটোর দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের কথা। অপদার্থ কর্তাব্যক্তিরা, যারা সম্রাটের নামে শাসন চালাত, রাজ্যের সর্বস্তরে শাসন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অবস্থার আরও অবনতি ঘটে, যখন তারা নিজেরা সামাল দিতে না পেরে ক্ষমতা তুলে দিল 'কনডেই' নামক স্থানীয় যোদ্ধাদের হাতে।

জাপানের বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার আকিরা কুরোসায়ার শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্রগুলির একটি হল 'সেভেন সামুরাই'। সামুরাই-নেতা কামবেই-এর চরিত্রে অভিনয় করেন তাকাশি শিমুরা। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল।

এদিকে স্থানীয় শাসনভার পাওয়া কনডেইরাও ক্ষমতা বিতরণ করতে লাগল অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ বেধে গেল। আর এই সুযোগ নিলেন দূরদর্শী সামুরাইরা। হেইয়ান শাসনকালের মধ্যপর্ব থেকেই একটু-একটু করে তাঁরা সরকারি ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে লাগলেন। একসময়ে ব্যক্তিগত জমিজমা বা শোয়েন' এবং ধর্মীয় সংস্থাগুলির একচ্ছত্র মালিকানা নিয়ে নিল তারা।

এখনকার ঐতিহাসিকদের মতে, সামুরাইরা মূলত 'বুশি' বা 'বুশিডান' নামের যুদ্ধবাজ দল। এঁরা পারিবারিক এককের চেয়ে সামান্য বড়। বুশিডানরা অবশ্য সারা বছরই যুদ্ধ নিয়ে মেতে থাকতেন না। অপেক্ষায় থাকতেন কবে যুদ্ধের ডাক আসবে। অন্যসময়ে চাষাবাদ নিয়ে থাকতেন তাঁরা। এগারোশো সালের মধ্যেই তাঁরা অন্যান্য ছোট-ছোট দলকে পরাজিত করে তাদের সঙ্গে প্রভু-সামন্ত সম্পর্ক স্থাপিত করলেন। এবং তা চলতে লাগল বংশানুক্রমে। সামন্তদের বলা হত কেনিন (গৃহস্থব্যক্তি) বা আইয়েঙ্কো (ঘরের ছেলে)। প্রভুদের দেখা হত পরিবারের পিতার মতো।

সামুরাইদের নেতা হতেন সাধারণত রাজপরিবারের লোকেরা। তখনকার দিনে সম্রাটদের অনেক সন্তান থাকত। ফলে সিংহাসনের বিবাদ মেটানোর জন্য তাদের বড় উপাধি দিয়ে (টায়রা এবং মিনামোটো) শান্ত করে রাখা হত। এদের মধ্যে কেউ কেউ কিয়োটোয় সভাসদ হিসেবে থেকে যেত, আবার কেউ-কেউ জেলাস্তরে শাসনক্ষমতা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ত। সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করত তারা। টায়রা আর মিনামোটোদের মধ্যে রেষারেষি শুরু হল একটি বিশেষ ঘটনাকে

'সেভেন সামুরাই' ছবির একটি দৃশ্য

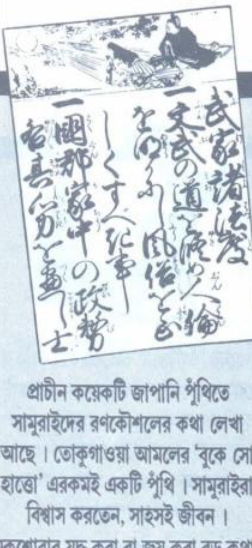

প্রাচীন কয়েকটি জাপানি পুঁথিতে সামুরাইদের রণকৌশলের কথা লেখা আছে। তোকুগাওয়া আমলের 'বুকে সো হান্তো' এরকমই একটি পুঁথি। সামুরাইরা বিশ্বাস করতেন, সাহসই জীবন। একশোবার যুদ্ধ করা বা জয় করা বড় কথা নয়, বিনা যুদ্ধে শত্রুকে বশ করাই ছিল তাঁদের প্রকৃত লক্ষ্য।

সামুরাই ও মার্শাল আর্ট

শ্রেষ্ঠ সামুরাই যোদ্ধারা অনেক চিন্তা আর পরিশ্রমের পর মার্শাল আর্টকে উন্নত ও পরিশীলিত করেন। হেইয়ান পর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে এর প্রয়োগ শুরু হয় ব্যাপকভাবে এবং সামুরাইদের যুদ্ধরীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে থেকে যায় মেইজি শাসনকাল পর্যন্ত। ইডো পর্বে, যখন দেশ জুড়ে শান্তি ফিরে এসেছে, মার্শাল আর্ট তখন ব্যবহৃত হতে লাগল শুধুই আত্মরক্ষার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এসে তা হয়ে উঠল টেকনিক-সর্বস্ব খেলা। বিভিন্ন সামুরাই নেতা খুলে বসলেন প্রতিষ্ঠান, বাড়তে লাগল পোশাকি লড়াইয়ের চল। যেমন, ইয়াগু স্কুলের 'ফুকুরো জিনাই' বা বাঁশের তরোয়ালের লড়াই। এ ছাড়া যুযুৎসু'র কায়দাকানুনও পরিবর্তিত হল। কিওকুশিন এবং কিটো স্কুলগুলি পরিশীলিত যুযুৎসুর খেলা শেখাতে শুরু করল। মেইজি শান্তিপর্বে পরিবর্তিত হল শুধুমাত্র 'নাগেওয়াজা' বা ছুঁড়ে ফেলা এবং 'কাটামেওয়াজা' বা আত্মরক্ষার কায়দায়। অবশ্য শেষের পদ্ধতিটির মধ্যে ছিল মোচড় দেওয়ার নিরীহ কয়েকটি প্রক্রিয়া।

সামুরাইরা মার্শাল আর্টকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। হত্যার মাধ্যমে আক্রমণ প্রতিরোধ, আঘাতের মাধ্যমে আক্রমণ প্রতিরোধ, হত্যা বা আঘাত ছাড়া আক্রমণ প্রতিরোধ।

পরে যদিও মার্শাল আর্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয় শুধুমাত্র 'কেন্‌ডো' বা তরোয়াল চালনা, 'জুডো' এবং 'কিউডো' বা তীরন্দাজি। কিন্তু গোড়ার দিকে, অর্থাৎ প্রায় দশম শতাব্দী পর্যন্ত ''বুগেই জুহাপ্পান' বা মার্শাল আর্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল আঠারোটি বিভাগ : তীরন্দাজি, অশ্বচালনা, বর্শা চালনা (সোজুৎসু), তরোয়াল চালনা, সাঁতার, নাগিনাটা চালনা, দড়ির খেলা, বর্তমান জুডো (ইয়াওয়ারা), ছুরি নিক্ষেপ

কেন্দ্র করে। মাৎসু'র উত্তরাঞ্চলে ইজো নামে একটি উপজাতি রাজত্ব চালাত। তখন পর্যন্ত তারা মূল জাপানের অন্তর্গত করতে চায়নি নিজেদের। পরের দিকে অ্যাবে নামে আর-একটি গোষ্ঠীও ইজোদের দেখাদেখি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তখন কিয়োটো থেকে পাঠানো হল এক মিনামোটো সেনাপতিকে। এর পর শুরু হল দুটি বিখ্যাত যুদ্ধ, —যার মোট সময়কাল ১০৫৭—১০৮৭। অবশেষে, ইজো, অ্যাবে এবং কিয়োহারা গোষ্ঠীগুলিকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে সেই মিনামোটো সেনাপতি মাৎসুদেওয়া'র উত্তরাঞ্চলকে জাপানের মূল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এর পর থেকে মিনামোটোরা স্বীকৃত হল সবচেয়ে শক্তিশালী সামুরাই গোষ্ঠী হিসেবে। রেষারেষির সূত্রপাত এখানেই।

মিনামোটো গোষ্ঠীর বিখ্যাত নেতা ছিলেন মিনামোটো নো ইয়োশি (১০৩৯-১১০৬)। তাঁকে ডাকা হত 'হাচিমান আরো' নামে

বীরত্বই ছিল সামুরাইদের আদর্শ

(যুদ্ধদেবতা হাচিমানের প্রথম সন্তান)। মিওয়া গেন্‌জি নামে একটি ঐতিহ্যপূর্ণ উপগোষ্ঠীর সূচনা করেন ইনি। নো ইয়োশি এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে কান্টো এবং অন্যান্য অঞ্চলের জনগণ স্বেচ্ছায় তাদের নিজস্ব জমির অধিকার তাঁকে দিয়ে দিত। ওদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'টর্‌ইয়ো' বা 'সর্বময় কর্তা'।

মিনামোটো নো ইয়োশির এই ক্রমবর্ধমান প্রতাপ কিয়োটোর সরকারি মহলে আশঙ্কার কারণ হয়ে দেখা দিল। এর ফলে, মিনামোটোদের প্রতিরোধ করতে টায়রা নেতাদের আরও বেশি করে ক্ষমতা দেওয়া শুরু হল। এদিকে মিনামোটোরাও চুপ করে বসে রইল না। বারোশো সালের মাঝামাঝি তারাও সভার ক্ষমতাপূর্ণ পদগুলো অধিকার করতে লেগে গেল।

এই সময়েই কিয়োটোয় পর-পর দুটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ— 'হোগেন অস্থিরতা' (১১৫৬) আর 'হেইজি অস্থিরতা' (১১৬০) — হয়ে গেল রাজ্যসভার সম্পূর্ণ ক্ষমতার দাবি নিয়ে। ইতিহাসের দিক থেকে বিধ্বংসী এই লড়াই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, জাপানের শাসনক্ষেত্রে, এই দুটি যুদ্ধের পর থেকেই সামুরাইদের আসন পাকা হয়ে গেল। প্রাথমিক পর্বে, টায়রারা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল, কিন্তু ১১৮৫ সালের গোড়ায় তারা পুরোপুরিভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেল মিনামোটোদের কাছে।

টায়রা-মিনামোটো যুদ্ধের নেতা ছিলেন মিনামোটো নো ইয়োরিটোমো, যিনি ১১৯২-এ জাপানে প্রথম সামরিক সরকার স্থাপন করেন— কামাকুরা শোগানেট (১১৯২-১৩৩৩)। সে-বছরই তিনি 'শেইটাই শোগান' বা 'অসভ্যজাতি দমনকারী সেনাপতি' পদে ভূষিত হন। মধ্যযুগের জাপানে এটি ছিল সামরিক সর্বাধিনায়কের পদ।

জাপানের বিভিন্ন মার্শাল আর্টের কয়েকটি হাতিয়ার

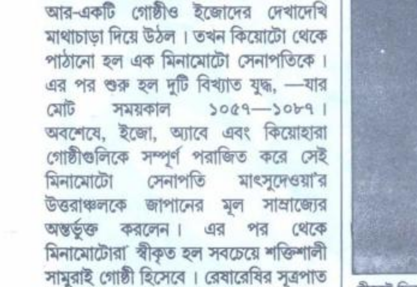

(শুরিকেন), গুপ্তচরবৃত্তি (নিন্‌জুৎসু) ইত্যাদি। এইসব বিভাগের মধ্যে তরোয়াল চালনা এবং যুযুৎসু ছিল চরম প্রয়োগ। তরোয়ালবাজ সামুরাইদের স্লোগান ছিল—'তরোয়ালের এক কোপে শত্রুকে দু'টুকরো করে দাও।' কিন্তু এটাই মার্শাল আর্টে-দক্ষ সামুরাইদের আসল পরিচয় বলে ভাবলে ভুল হবে। তা হলে বর্বর মোঙ্গল বা হুনদের সঙ্গে তাদের কোনও ফারাক থাকত না। কিন্তু সামুরাইদের বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, তাঁদের সামনে সবসময় থাকত শিক্ষকের বা গোষ্ঠীনেতার

বাণী— 'একশোবার যুদ্ধ করা বা জয় করা বড় কথা নয়, বিনা যুদ্ধে শত্রুকে বশ করাই প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত।' এর কারণ, মার্শাল আর্ট-প্রবক্তা সামুরাইদের

কাছে হিংসার থেকেও বড় কথা হল প্রকৃত যোদ্ধ মনোভাব, এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক চিন্তাশীল সামুরাই যোড়শ শতাব্দীতে মার্শাল আর্টে আধ্যাত্মিক বোধ জাগিয়ে তুলতে তৎপর হয়েছিলেন। তাঁরা এই ধারায় গড়ে তুলেছিলেন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিংকেজ তরোয়াল শিক্ষাকেন্দ্র তাদের মধ্যে অন্যতম। এখানে শিক্ষকদের মূল শিক্ষা ছিল 'তরোয়ালের আঘাত নয়'। একইভাবে ইডো পর্বের গোড়ায় যুযুৎসু শিক্ষাকেন্দ্র ইয়োশিন প্রতিষ্ঠানের মূল মন্ত্র ছিল—'কোনও হত্যা নয়'।

জীবনের নানা ওঠাপড়া যেন সহজে গায়ে না লাগে...

তাই হাত বাড়ালেই বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

শুষ্ক ত্বক ও সাধারণ কাটাছড়ায় অসাধারণ কাজ দেয়

ষাট বছর আগে প্রথম আজও প্রথম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস
কলকাতা ৭০০০৫৩

বোরোলীন প্রসাধন সামগ্রী নয়

Response 1038

১৩৩৩ সালে কামাকুরা শোগানেটকে উৎখাত করে দেয় মারোমাচি শোগানেট (১৩৩৩-১৫৭৩)। এই যুগে জাপানের সমাজব্যবস্থা মধ্যযুগীয় ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ধারায় বেড়ে ওঠে। কৃষকরা সারা জীবনের জন্য বাঁধা পড়ে যায় সামুরাই জমিদার প্রভুদের কাছে।

অবশেষে এই মারোমাচি শোগানেটেরও পতন ঘটল একদিন। এই শাসনকালের শেষ শতকে শুরু হল ওনিন যুদ্ধ (১৪৬৭-'৭৭)। ধীরে ধীরে এটি গৃহযুদ্ধের চেহারা নেয়। এই সময়কে বলা হয় 'সেংগোকু কাল'। মারোমাচিরা সবসময় যুদ্ধ নিয়ে মেতে থাকত বলে সুস্থির শাসনব্যবস্থার দিকে কখনও নজর দিতে পারেনি। আর এই সুযোগ নিল দাইমিয়ো নামক একটি গোষ্ঠী। গৃহযুদ্ধের শেষে মারোমাচিদের তারা যে সম্পূর্ণ হারিয়ে দিল তাই নয়, দেশের সামগ্রিক সংহতিও ফিরিয়ে আনল।

ষোড়শ শতকেই সামুরাই যুদ্ধরীতির মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এল। দাইমিয়ো নেতারা সৈন্যদলের সুসংবদ্ধতার ওপর জোর দিলেন। ঐতিহ্যবাহী অশ্বারোহী বাহিনীর পাশাপাশি এল পদাতিকরা (আশগাকু)। এদের বাছা হল কৃষক শ্রেণীর মধ্যে থেকে। জাপানে প্রথম অভিযাত্রী দল এসেছিল পোর্তুগাল থেকে, ১৫৪৩ সালে। দাইমিয়ো সৈন্যবাহিনীর হাতে কামান ও রাইফেল তুলে দিল তারাই।

সামুরাই-পতাকার সম্মানরক্ষাই ছিল বীরদের ধর্ম। সামুরাইরা ছিলেন যোদ্ধৃজাতি 'বুশি'-র অন্তর্ভুক্ত। সামুরাইদের আচরণবিধির নাম তাই 'বুশিডো'। 'বু' কথাটির অর্থ যোদ্ধা, 'শি' কথাটির অর্থ পরিবার বা গোষ্ঠী এবং 'ডো'-র অর্থ পথ। গুরুকে কীভাবে মেনে চলতে হবে সেটাই লেখা থাকত বুশিডোর পাতায়।

কিন্তু বহু সামুরাই নিজেদের ঐতিহ্যে এত বেশি আস্থাবান ছিলেন যে, বহুদিন অবধি তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেননি। সাবেকি তরোয়াল দিয়েই কাজ চালাতেন বেশি। এইরকম চলতে লাগল বহুদিন। এর ফলে, চলতি শতকের গোড়ার দিকে পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে যখন ভালভাবে পরিচয় হল, ছোটখাটো সংঘর্ষের সময়ে তাঁরা একেবারেই এঁটে উঠতে পারলেন না। এই অবস্থাটি নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে 'রেড সান' নামে একটি ছবিতে। জাপানের রাজদূতের সঙ্গে কী এক সরকারি কাজে টেক্সাস অঞ্চলে এসেছেন দুজন সামুরাই, দেহরক্ষী হিসেবে। হঠাৎ হামলা হল এক ডাকাতদলের। তারা জাপান সম্রাটের পাঠানো উপহারসামগ্রী লুঠ করে নিয়ে পালাল। তার মধ্যে ছিল একটি বহুমূল্য তরোয়াল। একজন ডাকাত শুধু পালাতে পারেনি (চার্লস ব্রনসন)। তাকে সঙ্গে নিয়ে সেই তরোয়াল ফিরিয়ে আনতে বেরোলেন একজন দেহরক্ষী সামুরাই (তোশিরো মিফিউন)। যতক্ষণ ব্রনসন খালি হাতে ছিল, কিছুতেই বাগে আনতে পারল না মিফিউনকে। ক্ষিপ্রতা এবং শক্তি, দু'দিক থেকেই সামুরাই টেক্সাসের ডাকাতটির তুলনায় অনেক এগিয়ে। হঠাৎই ব্রনসনের হাতে এসে গেল একটা রিভলভার। তরোয়াল হাতে মিফিউনের আর কিছু করার রইল না।

দাইমিয়ো রাজত্বকালে সমাজব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন— সামুরাই এবং কৃষক শ্রেণীর মধ্যে এক চিরকালীন বিচ্ছেদ। এতদিন অবধি অবসরকালে সামুরাইরা চাষ-আবাদ করতেন এবং অধিকাংশই গ্রামে থাকতেন। কিন্তু দাইমিয়ো কর্তাদের নির্দেশে তারা সবাই দুর্গবেষ্টিত নগরে চলে এলেন। অন্যদিকে, কৃষকদের নিষেধ করে দেওয়া হল, তাদের জমি কোনও অবস্থাতেই ছেড়ে না আসতে। এমনকী, তাদের অস্ত্র রাখার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল।

দাইমিয়োদের রাজত্বের পর এল টোকুগাওয়া শোগানেট (১৬০০-১৮৬৭)।

বীরত্ব আর কর্তব্যনিষ্ঠার যে উদাহরণ সামুরাইরা দেখিয়েছেন, ইতিহাসে তার সমকক্ষ আর কেউ নেই বললেই চলে। কুরোসায়ার 'কাগেমুশা' ছবিরও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এটাই।

জাপানে সামুরাইরা ছিলেন ওপরতলার মানুষ। ১৬০৩ থেকে ১৮৬৭-র মধ্যে সামুরাইদের সংখ্যা ছিল সাড়ে চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ।

অস্ত্রচালনার অভ্যাসই হয়ে দাঁড়াল সাংস্কৃতিক পরিচয়

এদের সময়ে দেশে আবার শান্তি ফিরে আসে। উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত তা বজায় ছিল।

কিন্তু শান্তি ফিরে আসতে-না-আসতেই অন্য অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। তাঁরা বেকার এবং অলস হয়ে পড়লেন। দাইমিয়ো শাসকদের অনুদানের দিকে তাকিয়েই বসে থাকত তারা। ফলে, তাদের নিজস্ব জীবনের ছন্দ হারিয়ে যেতে লাগল। তাই পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা এই যোদ্ধৃকুলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য 'বুশিডো' রীতি চালু করেন। ফলে যা ছিল ক্লান্তিকর দৈনন্দিন অস্ত্র-চালনার অভ্যাস, তা হয়ে উঠল জমজমাট এক সাংস্কৃতিক আসর।

এত কিছুর পরেও অধিকাংশ সামুরাইয়ের মধ্যে থেকে গোঁড়ামির ভাবটা কাটল না। টোকুগাওয়া শোগানেটের সময়ে জাপানের সঙ্গে পশ্চিমি সভ্যতার পরিচিতি যতই বাড়তে লাগল, সামুরাই গোষ্ঠীর নেতারা ততই শোগানেটের এই শৈথিল্যের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতে লাগলেন। ১৮৫৩ সালে নৌবাহিনী নিয়ে হাজির হলেন মার্কিন কমোডর ম্যাথিউ পেরি। জাপানের একঘরে থাকার দিন ফুরোল। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বিপক্ষ সামুরাই গোষ্ঠীর মধ্যে এতদিনের জমে থাকা অসন্তোষ ফেটে পড়ল। মাৎসুমা এবং চোশু অঞ্চলে শুরু হল শোগানেটের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ।

আসলে তখনও এইসব সামুরাই নেতা বুঝতে পারেননি যে, নতুন দিন আসছে, আর বেশিদিন তাঁরা একঘরে থেকে একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করতে পারবেন না।

মেইজি স্থিতিপর্বে সামুরাই শ্রেণীটিকে টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। তার প্রথম কারণ, সরকারের পক্ষে বংশানুক্রমে সামুরাইদের ভাতা জোগানো সম্ভব হচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত, আধুনিক সমরনীতি ও রীতি থেকে সাবেকি সামুরাইরা অনেক পিছিয়ে পড়ছিলেন।

কয়েকজন সামুরাই নেতা অবশ্য প্রথানুযায়ী যুদ্ধ না করে দলীয় রাজনীতিতে অংশ নিলেন। মেইজি সরকারের বিরোধী দল হিসেবে তাঁরা রাজনীতির মঞ্চে উঠে এলেন। অন্তত এইদিক থেকে বলা যায় সামুরাইরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দিশারী।

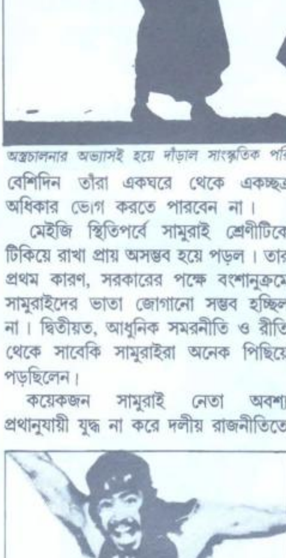

আধুনিক সমরনীতি ও রীতি থেকে সাবেকি সামুরাইরা অনেক পিছিয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁদের টিকিয়ে রাখা যায়নি

বীরত্ব আর কর্তব্যনিষ্ঠার যে উদাহরণ সামুরাইরা দেখিয়েছেন, ইতিহাসে তার সমকক্ষ আর কেউ নেই বললেই চলে। কুরোসায়ার 'কাগেমুশা' ছবিতে এই কথাটিই দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। মধ্যযুগের জাপানে বিভিন্ন দলনেতার একজন করে কাগেমুশা বা 'নকল' (ডামি) থাকত। যুদ্ধে কোনও কারণে নেতা মারা গেলে সাময়িকভাবে শত্রুদের বিভ্রান্ত করার জন্য বা নিজের সেনাবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাগেমুশা উপস্থিত হত। এরকমই এক দলনেতা শিংগেনের ছিল এক কাগেমুশা। শিংগেন মারা যাওয়ার পর তাকে দিয়ে কিছুদিন কাজ চালানো হয়। কিন্তু তার অকর্মণ্যতার জন্য তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল কয়েকদিন পরেই। ততদিনে সে নিজেকে সত্যিকারের সামুরাই বলে ভাবতে শুরু করেছে। এদিকে শত্রুরাও জেনে গেছে শিংগেন আর নেই। তারা জোট বেঁধে আক্রমণ চালিয়ে মৃত শিংগেনের দলকে প্রায় গুঁড়িয়ে দেয়। সমস্ত লড়াইটি ঝোপের আড়াল থেকে দেখছিল সেই কাগেমুশা। তারপর নিজেকে আর থামিয়ে রাখতে পারে না সে। পড়ে-থাকা শিংগেনের পতাকা তুলে নিয়ে সে একা ছুটে যায় শত্রুদলের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তার দেহ। নদীতে পড়ে যায় কাগেমুশা। ভেসে চলে উদ্দাম স্রোতের টানে। পতাকাটি কিন্তু তখনও তার হাতে ধরা রয়েছে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বন্দিনী তলতাদেবী কারাগারের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলেন, হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকিয়েও তিনি প্রথমে বুঝতে পারলেন না, কিসের শব্দ কিংবা শব্দটা কোথা থেকে আসছে।

দিনে ও রাতে সব সময়েই এই ঘর অন্ধকার থাকে। শুধু মাঝে-মাঝে একজন প্রহরী মশাল জ্বেলে খাবার দিতে আসে। তিনি দেখলেন, একটু দূরে মেঝেতে একটা মশাল পড়ে আছে, কোনও লোককে দেখা যাচ্ছে না।

আবার একটা হেঁচকির মতন শব্দ হল।

তলতাদেবী উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "কে ?"

এবার শব্দটা থেমে গেল।

তলতাদেবী বুঝতে পারলেন, ঘরের মধ্যে কোনও লোক আছে। প্রহরীরা এসে খাবার দিয়ে চলে যায়, কোনওদিন তো মাটিতে মশাল ফেলে রাখে না।

তলতাদেবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কে ?"

এবার একজন কেউ কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "মহারানি ! মহারানি !"

এবারে তলতাদেবী আরও অবাক হলেন। এই ঘরে যে দু'জন প্রহরী পালা করে আসে, তারা দু'জনেই বোবা-কালা। তারা মহারানির কোনও কথা শুনতে পায় না, তারা মহারানির সঙ্গে কোনও কথাও বলতে পারে না। ছন্তীর ইচ্ছেতেই এরকম ব্যবস্থা হয়েছে। আজ তবে ঘরের মধ্যে কে কথা বলছে ?

এতকাল ধরে বন্দিনী থাকলেও তলতাদেবীর মেজাজ রানিরই মতন রয়েছে, তিনি ভয় পান না, তাঁর কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর ফুটে ওঠে।

তিনি কড়া গলায় বললেন, "কে ওখানে ? লুকিয়ে রয়েছ কেন ?"

এবারে অন্ধকারের লোকটি বলল, "মহারানি, আমি জয়পাল !"

এই নাম শুনেও তলতাদেবী চিনতে পারলেন না। কে জয়পাল ? এই নিশ্ছিদ্র কারাগারের মধ্যে লোকটি এল কী করে ?

তলতাদেবী নিজেই এগিয়ে এসে মশালটি তুলে নিলেন। সেই আলোতে তিনি দেখতে পেলেন ঘরের এক কোণে হাঁটুতে মুখ গুঁজে একজন লোক বসে আছে, তার পোশাক প্রহরীদের মতন, তার কোমরে আঁটা আছে তলোয়ার।

লোকটি মুখ তুলল। তার দু' চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। তার সারা মুখে দাড়ি, সেই দাড়ি ভিজে গেছে চোখের জলে।

একজন প্রহরী ঘরের এক কোণে বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে, এ আবার কী অদ্ভুত ব্যাপার ?

লোকটি বলল, "মহারানি, আমি শিল্পী জয়পাল। আমাকে চিনতে পারছেন না ?"

মহারানি বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "শিল্পী ?"

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, "প্রণাম, মহারানি !"

তলতাদেবীর বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বহু বছর বাদে কেউ তাঁকে মহারানি বলে ডাকল, কেউ তাঁকে প্রণাম জানাল। তিনি তো আর এ রাজ্যের মহারানি নন, তিনি সামান্য একজন বন্দিনী।

জয়পাল বলল, "মহারানি, আপনার মনে নেই ? একবার আমাদের গ্রামে দাবানল এসে হানা দিয়েছিল। আমি নিজের বাড়িতে বসে আপনার মূর্তি গড়ছিলাম, সব কিছু পুড়ে যেত, তখন আপনি এসে আমাদের বাঁচালেন।"

তলতাদেবী অস্ফুট স্বরে বললেন, "তুমি সেই শিল্পী জয়পাল ? তুমি এখানে এলে কী করে ?"

জয়পাল বলল, "সে এক লম্বা কাহিনী, মহারানি ! আপনি রাজবাড়ির উদ্যানে আমার স্থান করে দিয়েছিলেন। সেখানে আমি মনের আনন্দে মূর্তি গড়তাম। হঠাৎ সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। মহারাজের মৃত্যু হল। আপনিও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আপনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন, তা-ও জানতে পারিনি প্রথমে। আমি আপনার একটা ছোট মূর্তি গড়েছিলাম, ছোট রাজকুমার তীক্ষ্ণ সেটা নিয়ে গিয়েছিল রাজবাড়ির মধ্যে। সেটা দেখে রাজপুরোহিত ছন্তী দারুণ রেগে গেলেন, মূর্তিটা ভেঙে ফেললেন। আমাকেও হত্যা করার আদেশ দিলেন। ছন্তী নিজেই তো রাজা হয়ে বসেছেন, তা জানেন কি ? উনি সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুর, কত লোককে যে মেরে ফেলার আদেশ দেন, তার ঠিক নেই।"

তলতাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, "ছন্তী তোমাকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছিলেন, তবু তুমি বাঁচলে কী করে ?"

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবারে দ্যাখো আঁকার পাতায়
ফুটে উঠেছে দুটি কুকুর।
তোমরা যদি অন্য কিছু এঁকে থাকো,
তা হলে দ্যাখো তো তোমাদের
কল্পনার সঙ্গে আমার কল্পনা মিলেছে
কি না !

জয়পাল বলল, "বাঁচা খুবই শক্ত ছিল। আমি পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলাম বেণুপালের বাড়িতে। বেণুপাল আমার স্ত্রীর ভাই, আমাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। সে-বাড়ির গোয়ালঘরে লুকিয়ে রইলাম দিনের-পর-দিন। কিন্তু সেভাবে তো বেশিদিন থাকা যায় না। লোকে জেনে যাবেই। এক সময় বেণুপাল একটা ভাল বুদ্ধি করল। আমার মাথায় তখন বড়-বড় চুল, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, আমাকে সহজে চেনা যায় না। সেই অবস্থায় আমাকে নিয়ে গিয়ে বেণুপাল প্রহরীদের দলে ভর্তি করে দিল। তখন কিছু নতুন প্রহরী নেওয়া হচ্ছিল। আমি অন্য কোনও ছদ্মবেশ ধরে থাকলেও প্রহরীরা একদিন-না-একদিন ধরে ফেলতই আমাকে। কিন্তু প্রহরী সেজে থাকলে কে আমাকে সন্দেহ করবে ? অনেক সময় আমিই অন্য প্রহরীদের সঙ্গে জয়পালকে খুঁজতে গেছি। এখন আমার নাম বজ্রপাণি।"

তলতাদেবী বললেন, "ছিলে শিল্পী, হয়ে গেলে সৈনিক ?"

জয়পাল বলল, "হ্যাঁ, মহারানি ! আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম বটে কিন্তু আমার মনে সুখ নেই। বেণুপাল আমাকে সাবধান করে দিয়েছে, কিছুতেই আর আমার মূর্তি গড়া চলবে না। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও আর জানতে না পারে যে, আমি এককালে শিল্পী ছিলাম ! মহারানি, আপনিই বলুন, এককালে আমি এই হাত দিয়ে পাথর কেটে মূর্তি বানাতাম, এখন কি এই হাত দিয়ে তলোয়ার-বর্শা ধরতে ভাল লাগে ?"

তলতাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমার মূর্তি গড়েছিলে বলে ছন্তী তোমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবু তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে কোন সাহসে ? বোবা-কালা প্রহরীদের বদলে তুমি এলেই বা কী করে ?"

জয়পাল বলল, "যে বোবা-কালা রক্ষীটি এখানে আসত, গতকাল থেকে তার ভেদ-বমি হচ্ছে, তার বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। হঠাৎ অন্য একজন বোবা-কালা রক্ষী পাওয়া যাবে কোথায় ? কারও জিভ কেটে বোবা করে দেওয়া যায় বটে, তবু তো সে কানে শুনতে পাবে। আমার শ্যালক বেণুপাল এখন এই কারাগারের অধ্যক্ষ। তাকে বলে-কয়ে রাজি করিয়ে আমি এখানে এসেছি।"

কথা বলতে-বলতে আবার জয়পালের চোখে জল এসে গেল। বাঁ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে সে ধরা গলায় বলল, "নিয়তি ! নিয়তি ! এতকাল পর আপনাকে আবার দেখতে পেলাম। কিন্তু মহারানি, আপনাকে প্রথম দেখে আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি। মশালের আলোয় দেখলাম, আপনি মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। এত বড় একটা দেশের মহারানি, সোনার পালঙ্কে দুধের মতন সাদা বিছানায় আপনার শুয়ে থাকার কথা। আপনাকে শুতে হচ্ছে এই অন্ধকার ঘরে পাথরের মেঝেতে !"

তলতাদেবী বললেন, "অত বিচলিত হোয়ো না, জয়পাল। আমার আর কষ্ট হয় না, সহ্য হয়ে গেছে। তুমি সাবধানে থেকো। ছন্তী অতি ধূর্ত। তিনি যদি কোনওক্রমে তোমার পরিচয় জানতে পারেন, তা হলে আর রক্ষে রাখবেন না।"

জয়পাল বলল, "আমি সহ্য করতে পারছি না। আপনার এই অবস্থা কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। আপনাকে আজই আমি এই কারাগারের বাইরে নিয়ে যাব। আপনাকে অনেক দূরের এক গ্রামে লুকিয়ে রাখব। দেশের মানুষকে আপনার কথা ধীরে-ধীরে জানাব। তারাই আপনাকে আবার সিংহাসনে বসাবে।"

তলতাদেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ওসব কথা এখন বোলো না, জয়পাল। আমার পালাবার কোনও উপায় নেই। ছন্তী

বলে দিয়েছেন, আমি পালাবার চেষ্টা করলেই তিনি একে-একে আমার ছেলেদের বধ করবেন। আমার দুই ছেলে কোথায় আছে, আমি জানি না। তুমি তাদের খবর কিছু জানো?"

জয়পাল বলল, "কিছু-কিছু শুনেছি! রাজকুমারের ওপর ছন্তীর ব্যবহার বড় অদ্ভুত। ছোট রাজকুমার তীক্ষ্ণকে ওই ছন্তী ভালবাসে, তাকে রেখেছে রাজপ্রাসাদে। আর বড় রাজকুমার দৃঢ়কে রেখেছে কারাগারে, তার সঙ্গে ছন্তী একদিনও দেখা করেনি এ পর্যন্ত!"

তলতাদেবী ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "দৃঢ় কোথায় আছে; কোন্ কারাগারে!"

জয়পাল বলল, "মহারানি, আমি যতদূর শুনেছি, বড় রাজকুমারকে এই কালাঘর বন্দীশালাতেই কোনও একটা কক্ষে রাখা হয়েছে।"

"সে কি জানে আমি বেঁচে আছি কি না?"

"তা আমি জানি না। আমি তাকে দেখিনি!"

"জয়পাল, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি যে-কোনও উপায়ে পারো আমার দুই ছেলের সঙ্গে দেখা করো। এমনও হতে পারে যে, ছন্তী তাদের দু' জনকেই বুঝিয়েছে যে, তাদের বাবা আর মা কেউ বেঁচে নেই। তুমি তাদের জানিয়ে দাও যে আমি বেঁচে আছি। যে-কোনও উপায়েই হোক, আমাদের আবার দেখা হবে। মহারাজের হত্যার প্রতিশোধ আমরা একদিন ঠিকই নেব।"

"আমি এই কারাগারে বড় রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করতে পারি। সেটা খুব কঠিন হবে না। বড় রাজকুমারকে এখান থেকে পালাবার ব্যাপারে সাহায্যও করতে পারি। কিন্তু ছোট রাজকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করব কী করে? রাজপ্রাসাদে তো আমি ঢুকতে পারব না। শুনেছি, ছোট রাজকুমারের সঙ্গে বাইরের কোনও লোক কথা বলতে পারে না। ছন্তী সব সময় তার কাছে-কাছে থাকে।"

"তুমি তা হলে বড় রাজকুমারের সঙ্গেই দেখা করো। সে কেমন আছে আমাকে জানাও!"

"আমি আজই যাব তার কাছে।"

আরও কিছুক্ষণ সুখ-দুঃখের কথা বলার পর জয়পাল বিদায় নিল।

তলতাদেবী দেওয়ালে হেলান দিয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। তাঁর বুকের মধ্যে এক প্রবল আলোড়ন হচ্ছে। বছরের পর বছর একইরকম ভাবে কেটে যাচ্ছিল, এখান থেকে মুক্তি পাবার কোনও আশাই ছিল না। হঠাৎ যেন জয়পাল নিয়ে এল এক নতুন আশার আলো।

এতদিন তিনি তাঁর দুই ছেলের কোনও খবর পাননি। এখন অন্তত জানলেন যে তারা দু'জনেই বেঁচে আছে। ছন্তী রাজকুমারদের হত্যা করেননি।

জয়পাল ফিরে এল সন্ধের সময়।

রাজকুমার দৃঢ়র কাছে সে খুব একটা আশার কথা শোনেনি। মায়ের খবর শুনে সে খুব কেঁদেছে। সেও তার মা ও ছোট ভাইয়ের কোনও খবর জানত না। তার ধারণা ছিল, মা বেঁচে নেই।

কিন্তু কারাগার থেকে মুক্ত হবার কোনও ইচ্ছেই নেই বড় রাজকুমারের। একবার সে পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দিনের আলো তার সহ্য হয় না। সে অন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরেই তাকে থাকতে হবে সারাজীবন।

তলতাদেবী হাহাকারের স্বরে বললেন, "তুমি কী বলছ, জয়পাল? সত্যিই কি দৃঢ় অন্ধ হয়ে গেছে?"

জয়পাল বলল, "না, মহারানি। আমি মশালের আলোয় তাকে ভাল করে দেখেছি। চোখ ঠিকই আছে। কিন্তু, বহু বছর সূর্যের আলো দেখেনি বলে তার চোখে আলো সহ্য হবে না। বড় রাজকুমার

বলল, রোদ তার চোখে কাঁটার মতন ফোটে।"

তলতাদেবী বললেন, "সে তো হবেই। প্রথম কয়েকদিন তার চোখে রোদ সহ্য হবে না। তা বলে সারাজীবন অন্ধকার ঘরে থাকবে কেন? যত কষ্টই হোক, তবু মুক্তি আর স্বাধীনতা অনেক বেশি কাম্য। জয়পাল, তুমি আবার যাও! তাকে বুঝিয়ে বলো, তার ওপরেই এখন আমার সব আশা, ভরসা। সে এখন বড় হয়েছে। এই রাজ্যের সিংহাসনের ওপর তারই একমাত্র দাবি আছে। যে-কোনও প্রকারে বাইরে গিয়ে তাকে এখন সৈন্য-সামন্ত জোগাড় করতে হবে। দেশের মানুষ তার পরিচয় জানতে পারলে নিশ্চয়ই তার দলে যোগ দেবে। ছন্তীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা ছন্তীকে বিনাশ করবে। তুমি দৃঢ়কে গিয়ে বলো, সে একদিন এসে তার মাকে উদ্ধার করবে, তার মা সেই আশা করে আছে!"

জয়পাল মাথা চুলকে বলল, "কিন্তু মহারানি, রাজকুমার দৃঢ় আলোতে বেরোতে খুবই ভয় পাচ্ছে। বাইরে যাবার কোনও ইচ্ছেই নেই!"

তলতাদেবী দৃঢ়ভাবে বললেন, "তুমি গিয়ে তাকে বোঝাও! চোখে আলো সহ্য না হলে সে অন্ধকারের মধ্যে বেরোবে। রাত্তিরবেলায় যাতে কারাগার থেকে পালাতে পারে, তুমি সেই ব্যবস্থা করো। রাত্তিরবেলা সে অনেক দূরে চলে যাক। পরের দিন সকালে তাকে বলো চোখে একটা কাপড় বেঁধে রাখতে। দু-একদিন এরকম ভাবে থাকলেই আস্তে-আস্তে তার চোখে আবার আলো সহ্য হবে! যাও জয়পাল, তাকে গিয়ে বলো, সে কি তার মাকে বাঁচাতে চায় না? সে কি পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে চায় না? বীরের রক্ত কি নেই তার শরীরে?"

জয়পাল আবার চলে গেল রাজকুমার দৃঢ়র কাছে। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

O&M 1955 BEN

যখন ব্যথা করে, কার কথা মনে পড়ে?

অমৃতাঞ্জন। প্রায় একশ বছর ধরে, মাথা-ধরা, পিঠে ব্যথা, মচকানো— শরীরের যাবতীয় ব্যথা-বেদনায় অমৃতাঞ্জন আরাম দিয়ে এসেছে। নির্ভরযোগ্য স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন সারা জীবন ধ'রে আপনার বিশ্বস্ত সেবক।

অমৃতাঞ্জন
পেইন্ বাম

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড

ক্যাম্পাস

রতনতনু ঘাটী

কলকাতাকে সুন্দর করে তুলতে

এক বৃদ্ধা ভিখিরি ময়লা কাগজ রাস্তায় ফেলছিল, এমন সময় খাবারের দোকানের একটি ছেলে ছুটে গিয়ে তাকে থামাল। বলল, "রাস্তায় ময়লা ফেলছ কেন ? দেখছ না, স্কুলের মেয়েরা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করেছে, ময়লা ফেলার জায়গা করে দিয়েছে। ময়লা ফেলার জায়গায় গিয়ে ময়লা ফ্যালো, যাও।" ভিখিরিবুড়ি ময়লা কাগজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। আনোয়ার শাহ রোডে টালিগঞ্জ গার্লস' হাই স্কুলে যাওয়ার রাস্তার মুখে এই দৃশ্য দেখে খুব ভাল লাগল। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-এর সমাজকল্যাণ শাখা— সিটিজেন অ্যাকশন ফোরাম নিরক্ষরতা দূর, রোগ-ব্যাধি সমূলে উৎপাটন, মাদকবিরোধী

সাফাই অভিযানে নেমে পড়েছে সবাই

আন্দোলন চালানো ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং এই শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন করার জন্য 'ক্লিনার ক্যালকাটা কনটেস্ট'-এর আয়োজন করেছিলেন স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে, এই দৃশ্য দেখে মনে হল, তা সফল হয়েছে এবং এই প্রতিযোগিতা তাদের মনে বেশ প্রভাব ফেলেছে। কলকাতার ৫৬টি স্কুলের প্রায় ৬০ হাজার ছেলেমেয়ে মাসাধিক কালের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল দেখবার মতো।

কলকাতাকে সুন্দর করে তোলবার জন্য স্কুলের ছেলেমেয়েরা রাস্তা ঝাঁট দিয়েছে, নর্দমা পরিষ্কার করেছে। ছবি এঁকেছে দেওয়ালে। অনেক স্কুল এই নিয়ে বিতর্ক এবং আলোচনাসভা করেছে।

কোনও-কোনও স্কুল মাদক ব্যবহারের বিরুদ্ধে ক্যাম্প করেছে। অনেক স্কুল আবার রাস্তার মোড়ে-মোড়ে মিটিং করে, পথ-নাটিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছে তাদের বক্তব্য। কোনও-কোনও স্কুল বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করেছে। স্বাস্থ্য-পরিচর্যার জন্যও কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কোনও স্কুল আয়োজন করেছে রক্তদান শিবিরের।

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার দশ হাজার টাকা পেয়েছে টালিগঞ্জ গার্লস' হাই স্কুল, দ্বিতীয় পুরস্কার সাত হাজার পাঁচশো টাকা পেয়েছে কারমেল প্রাইমারি স্কুল, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে গিরিবালা সরকার বালিকা বিদ্যালয় ও ঢাকুরিয়া পরেশনাথ বালিকা বিদ্যালয়, চতুর্থ পুরস্কার তিন হাজার টাকা পেয়েছে সেন্ট লরেন্স হাই স্কুল। এ ছাড়া আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে আটটি স্কুলকে, এক হাজার টাকা করে পেয়েছে চব্বিশটি স্কুল এবং বারোটি স্কুল কাপ পেয়েছে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন দেওয়ালে-দেওয়ালে ছবি আঁকছে, নর্দমা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে, গাছ লাগাচ্ছে, সর্বনাশা মাদক ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছে, নিরক্ষরকে করে তুলছে সাক্ষর, দেওয়ালে-দেওয়ালে স্লোগান লিখছে—'আমার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন কলকাতার জন্য'— তখন মনে হয় কলকাতাকে সুন্দর করে তুলতে পারে একমাত্র ছোটরাই।

পুরস্কারের টাকায় বই কিনে দেওয়া হবে গরিব মেয়েদের

কলকাতাকে পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে টালিগঞ্জ গার্লস' হাই স্কুল। গতবারেও প্রথম হয়েছিল এই স্কুল। গতবারের মতো এবারেও এই স্কুল পেয়েছে দশ হাজার টাকা, প্রথম পুরস্কার হিসেবে। আর পেয়েছে 'ব্রিটানিয়া ট্রোফি'। প্রধানশিক্ষিকা মমতা ঘোষ বললেন, "এই পুরস্কারের টাকায় আমরা গরিব মেয়েদের বই কিনে দেব, বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করব মেধাবী এবং গরিব মেয়েদের।"

এবারেও তাদের স্কুল প্রথম হয়েছে শুনে খুশি হয়েছে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী সুপর্ণা বিশ্বাস। সুপর্ণা বলল, "আমি রাস্তা ঝাঁট দিয়েছি, ঘাস কেটেছি, মাটি কুপিয়েছি। খুব ভাল লাগে এইসব কাজ করতে।" ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী নাজমা খাতুন। নাজমা তো খুব আনন্দের সঙ্গেই বলল, "রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে আমার খুব ভাল লাগে। কী সুন্দর দেখতে লাগে।"

মনোরমা ঘোষাল পড়ে সপ্তম শ্রেণীতে। মনোরমা বলল, "কলকাতাকে পরিষ্কার রাখা নিয়ে আমরা নাটকও করেছি।" নাটকে অংশগ্রহণ করেছিল অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী শতরূপা দাস। রুম্পা ঘোষ, মাধবী দাস, প্রদীপ্তা রায়, সোমা বসু, ইসরাত আরা বেগম— এরা সবাই নবম শ্রেণীর ছাত্রী। এরা বলল, "এই কাজ করতে গিয়ে আমাদের দারুণ ভাল লেগেছে।" সহশিক্ষিকা অঞ্জলি সেনগুপ্ত বললেন, "স্কুলের মেয়েরা সবাই সমানভাবে কাজ করেছে। পুরস্কার বড় কথা নয়, নিজেরা পরিষ্কার থাকব— এই শিক্ষা আমরাও নিয়েছি, মেয়েরাও গ্রহণ করেছে।"

দেওয়ালে ছবি আঁকছে মেয়েরা

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট

ক্যাম্পাস

হোস্টেল

বন-ব্যবস্থাপনার এই শিক্ষায়তনটি ভোপালের নেহরুনগরে পাহাড়ের ওপরে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ৮০ হেক্টর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে। তরুণ স্নাতকদের এখানে দু' বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ফরেস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট পড়ানো হয়। কোর্সশেষে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয় ফরেস্ট্রি ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে সুদক্ষ বন-প্রশাসক দরকার। এই দায়িত্বটিই পালন করছে ভোপালের শিক্ষায়তনটি।

পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য বনসৃজন ও বনসংরক্ষণের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এজন্য আলাদাভাবে সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশ মন্ত্রকের। পরিবেশমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন পুরো ব্যাপারটা দেখাশোনার জন্য। বিভিন্ন রাজ্য সরকারও আলাদাভাবে পরিবেশ দফতর খুলেছেন এবং কাজকর্ম শুরু করেছেন।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বনসৃজন এবং বনসংরক্ষণের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে, সেজন্য সঙ্গত কারণেই দরকার দক্ষ বন-প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকের। ভারত সরকারের পরিবেশ, বনসম্পদ ও বন্যপ্রাণী মন্ত্রক ১৯৮২ সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন। বনসম্পদ প্রশাসন শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে এখানে গবেষণারও সুযোগ রয়েছে। ফলে বর্তমান ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি এবং জ্ঞানের ব্যবহারও সহজসাধ্য হবে।

বনপ্রশাসনে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম

প্রথমেই জানা দরকার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বনসম্পদ প্রশাসনের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ১৯৮৮ সালের জুলাই মাস থেকে ইনস্টিটিউট তরুণ স্নাতকদের জন্য দু' বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ফরেস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট (সংক্ষেপে পি এফ এম) শুরু করেছেন। যে-কোনও শাখার স্নাতক এই সুযোগ নিতে পারেন। কোর্স শেষে ছাত্রছাত্রীদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ পি জি ডি এফ এম দেওয়া হয়। এই কোর্সের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ; প্রথমত, বনসৃজনের এবং বনসংরক্ষণের নানা বিজ্ঞানসম্মত এবং কারিগরি দিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমস্যার সঙ্গে মানবিক এবং কারিগরি অভিজ্ঞতার পরিচয় গড়ে তোলা; তৃতীয়ত, প্রশাসক হিসেবে সমস্যার মূল্যায়ন এবং সমাধানের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া শেখা। এ ছাড়া বনসম্পদ, বন্যপ্রাণী, পরিবেশগত নানা দিক সম্বন্ধে জানবারও বিশেষ সুযোগ আছে। বনজ শিল্পের সঙ্গে নানা জীবিকার মানুষ জড়িত। তা ছাড়া এই শিল্পের সঙ্গেও হাজার হাজার মানুষের রুজির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তাই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এই শিল্পের সঙ্গে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন দক্ষ বন-প্রশাসকের।

স্নাতকোত্তর এই শিক্ষাক্রমের মেয়াদ ৮৫ সপ্তাহ। এর মধ্যে চার সপ্তাহের গরমের ছুটি এবং এক সপ্তাহের দেওয়ালির ছুটি রয়েছে। বাদবাকি ৮০ সপ্তাহ কার্যকালকে আট ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। এক একটি কার্যক্রমে থাকে ১০ সপ্তাহের পাঠক্রম। এর মধ্যে পাঁচ সপ্তাহের ক্লাস হয় ঘরে বসে, এক সপ্তাহ চলে ফিল্ড ওয়ার্ক এবং বাকি দু' সপ্তাহ সাংগঠনিক ট্রেনিং দেওয়া হয়। ক্লাসে মোটামুটি থিওরি পেপারগুলি পড়ানো হয়, কিন্তু তার সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্ক ও সাংগঠনিক ট্রেনিংয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকে, যাতে মনে হয় পুরো বিষয়টি শেখা হয়ে গেল।

ফিল্ডওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে জন্মায় বন সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীর বাস্তব জ্ঞান। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামো, আদিবাসী এবং দরিদ্র গ্রামবাসীদের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়েও সচেতন করা হয়। সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনের কাজকর্ম, শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনে প্রশাসনিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, এবং কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া অভিজ্ঞ ফরেস্টার, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী প্রশাসকদের আমন্ত্রণ করে এনে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখবার সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁরা বনসম্পদ এবং বনজশিল্প সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান এবং সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই বক্তব্য ও আলোচনা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে খুবই কাজে লাগে।

এখানে শিক্ষারীতির মধ্যেও অভিনবত্ব রয়েছে। পুরো ব্যাপারটাই হাতে-কলমে শেখানোর মতো। যেমন, বিশ্লেষণাত্মক প্রশাসনিক দক্ষতা বিষয়ে প্রাথমিক

অমর দাশ

ভাবে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করা হয়, দলবদ্ধ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়, দল ভাগ করে দেওয়া হয় বিশেষ কাজের দায়িত্ব । মানবিক ও সামাজিক দক্ষতা বিষয়ে শেখানোর সময় ফিল্ড-ওয়ার্ক এবং সাংগঠনিক ট্রেনিংয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে।তা ছাড়া গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব এবং সাংগঠনিক রূপরেখার বিষয়ে বিশদভাবে শেখানো হয় । ফিল্মের মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে, এমনকী,ঘুরে-ঘুরে বিভিন্ন কারিগরি তথ্য বিষয়ে ওয়াকিবহাল করানো হয়, সঙ্গে থাকে সাংগঠনিক ট্রেনিং । ফিল্ড-ওয়ার্কের ওপর খুব জোর দেওয়া হয়। সর্বোপরি রয়েছে অধীত বিদ্যার প্রয়োগকৌশল, নীতি নির্ধারণ ও সংগঠনের লক্ষ্যে পৌঁছনোর বিষয়ে কোনও বিশেষ কাজে ছাত্রছাত্রীদের নিযুক্ত করে প্রয়োগকৌশল এবং সংগঠনের লক্ষ্য বিষয়ে হাতেনাতে শিক্ষা । সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিষয়সূচী, সাংগঠনিক অনুশীলন, খেলাধুলো ইত্যাদি বিষয়ের সাহায্য নেওয়া হয় । বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে সেই বিষয়ে টার্মপেপার দাখিল করতে হয়, ছাত্রছাত্রীদের স্ট্রাটেজি এবং পলিসি-কেস নিয়ে আলোচনা করা হয় । প্রয়োজনে নীতিনির্ধারক, প্ল্যানার প্রমুখের সঙ্গেও আলোচনা বা বক্তৃতামালার ব্যবস্থা আছে । শ্রেণীকক্ষে শেখানো বিষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রয়োগ, বাস্তব সমস্যা, প্রশাসনিক দক্ষতা, নীতি নির্ধারণ সমস্ত কিছুই একবারে শেখানো হয়ে থাকে। তাই শ্রেণীকক্ষ, ফিল্ড-ওয়ার্ক এবং সাংগঠনিক ট্রেনিংয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত শিক্ষারীতি অনুসরণের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এখানে । শিক্ষাক্রম এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রীদের সমানভাবে শ্রেণীকক্ষ, ফিল্ড-ওয়ার্ক বিষয়ে অনিবার্যভাবে অংশ নিতে হয় । এবং সেক্ষেত্রে আলাদাভাবে তার মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে । সুতরাং ভাল ফলাফল করতে হলে টার্ম পরীক্ষার সঙ্গে ফিল্ড-ওয়ার্ক, ট্রেনিং সব-বিষয়েই জোর দিতে হয় ।

কীভাবে ভর্তি হবেন

আগেই জানিয়েছি, এই স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হতে হলে যে-কোনও শাখার স্নাতক হলেই চলবে । অর্থাৎ কলা, বাণিজ্য কিংবা বিজ্ঞান কোনও শাখার স্নাতকদের জন্যই এটি বিশেষ পাঠক্রম নয়, সবাই ভর্তি হতে পারবেন । তবে একটি শর্ত আছে । শর্তটি হল : ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্থাৎ স্নাতক পরীক্ষায় এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে । তফসিলি জাতি বা উপজাতির প্রার্থী হলে এই প্রাপ্ত নম্বরের ন্যূনতম হার হবে ৪৫ শতাংশ । এ ছাড়া আরও একটি বিশেষ শর্ত আছে । এটিও মোটেই উপেক্ষণীয় নয় । যেমন দশম, একাদশ কিংবা দ্বাদশ শ্রেণীর কোনও একটি সরকারি পরীক্ষায় কমপক্ষে এগ্রিগেটে ৫০ শতাংশ

নম্বর পেয়ে পাশ করা চাই। তবে তফসিলি জাতি বা উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ছাড় আছে । তাঁদের ক্ষেত্রে যে-কোনও একটি পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ নম্বর পেলেই চলবে । যাঁরা ডিগ্রি ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন তাঁরাও এই পাঠক্রমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন । তবে নির্দিষ্ট সময়ের আগে যেমনটি চাওয়া হয়েছে তেমন নম্বর পেয়ে ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ এবং প্রমাণপত্র দেখানো চাই । তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে ।

প্রার্থী মনোনয়নের জন্য জাতীয় স্তরে সারা দেশ জুড়ে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় । যেসব ছাত্রছাত্রীর সঠিক শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, তাঁদের সবাইকে লিখিত পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হয় । লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে দলবদ্ধ আলোচনা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয় । এভাবেই চূড়ান্ত প্রার্থী-তালিকা ঠিক করা হয়ে থাকে। সারা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরীক্ষার কেন্দ্র খোলা হয় । যেমন আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, ভোপাল, ভুবনেশ্বর, বোম্বাই, কলকাতা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, গুয়াহাটি, হায়দরাবাদ, জয়পুর, লখনউ, মাদ্রাজ, নাগপুর, পাটনা, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি ।

পড়াশোনার খরচপত্র

এই ইনস্টিটিউটে পড়তে গেলে ছাত্র-ছাত্রীর কোনও পয়সাকড়িই খরচ হয় না । কেননা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকেই মাসে এক হাজার টাকা করে স্কলারশিপ দেওয়া হয় । হিসেব করে দেখা গেছে, মাসিক স্কলারশিপের টাকা থেকেই ছাত্রদের পড়াশোনার সব খরচ মেটানো সম্ভব হয় । থাকা-খাওয়ার খরচ পর্যন্ত এই টাকা থেকেই মেটানো যায় ।

ভবিষ্যৎ সুযোগ

এই ইনস্টিটিউটে ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টের সুযোগ আছে । অর্থাৎ, পড়াশোনা চলার সময় অনেক সংস্থা এই ইনস্টিটিউটে আসেন তাঁদের প্রয়োজনমতো স্নাতকদের নিয়োগ করতে । ইনস্টিটিউটের নিয়োগ-কার্যালয় ছাত্র এবং বিভিন্ন সংস্থার এই অর্থকরী যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন । এ-বছরের এপ্রিল মাসে এই সংক্রান্ত নিয়োগের প্রথম পর্যায় বাস্তবায়িত হবে । ট্রাইফেড, এন টি পি সি, ইফকো, এইচ পি সি, ফরেস্ট ডিভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন, সোসাইটি ফর প্রিভেনশন অব ওয়েস্টল্যান্ডস ডিভেলাপমেন্ট , ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ফোর্ড ফাউন্ডেশন প্রভৃতি বড় বড় সংস্থা ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদের অর্গানাইজেশনাল ট্রেনিং অর্থাৎ সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ দিচ্ছেন । এভাবে দু' মাসের ট্রেনিংয়ের সময় প্রতি ছাত্র গড়ে পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন ।

কোথায় দরখাস্ত করতে হবে

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদনপত্র এবং লিখিত পরীক্ষার নিয়মকানুন সম্বলিত প্রসপেকটাস পাওয়া যাবে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট শাখা থেকে নগদ ৭৫ টাকার বিনিময়ে । অথবা, সরাসরি ডিরেক্টর, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট, নেহরুনগর ভোপাল—এই ঠিকানায় ৭৫ টাকার পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্কড্রাফ্ট পাঠিয়ে ভর্তির ফর্ম সংগ্রহ করা যেতে পারে ।

ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে আছে অ্যাকাডেমিক কমপ্লেক্স, লাইব্রেরি, কম্পিউটার সেন্টার, হস্টেল ইত্যাদি । ফরেস্ট্রি, ইকোলজি, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় বইপত্র আছে এই লাইব্রেরিতে ।

এই শিক্ষায়তনে ভর্তি হতে হলে লিখিত পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হবে । কমপ্রিহেনশন, অ্যানালিসিস অব সিচুয়েশন, ডেটা সাফিসিয়েন্সি প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় । এই পরীক্ষায় পাশ করার পর আছে গ্রুপ ডিসকাশন ও পার্সোনাল ইন্টারভিউ ।

যে-যুদ্ধ নিয়ে টেনিসন লিখেছিলেন বিখ্যাত কবিতা

রাগ্লান ও কার্ডিগানকে এখনও আমরা ভুলে যাইনি । কেন ?

দিনটা ছিল ১৮৫৪ সালের ২৫ অক্টোবর । স্থান ক্রিমিয়ান যুদ্ধের বালাক্লাভা রণক্ষেত্র । সাঁপো শৈলশিরা থেকে ওই রণক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে এক তীব্র অসন্তোষে ভুগছিলেন ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ লর্ড রাগ্লান । সেদিন ভোরবেলা রুশ সেনাদের এক ঝটিকা-আক্রমণের মুখে পড়ে তাঁর ব্রিটিশ ও তুর্কি সেনাদল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । রুশ সেনারা থেমে গেছে, কিন্তু জেনারেল কার্ডিগানের লঘু অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত সৈন্যদল (লাইট ব্রিগেড) একেবারেই অকর্মণ্য হয়ে বসে পড়েছে । ওই সেনাদের সব কিছু আক্রমণ করে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । রাগ্লান দেখলেন, বিজয়ী রুশ সেনারা যুদ্ধে জেতা কামানগুলি পাহাড়ের ওপর দিয়ে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে । সম্ভবত, লাইট ব্রিগেডের অবস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে তারা বেরিয়ে যাবে । রাগ্লান সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সহকারী ক্যাপ্টেন নোলানকে জেনারেল লুকানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । জেনারেল লুকান পদমর্যাদায় কার্ডিগানের চেয়েও উচ্চপদাভিষিক্ত, তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, "সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যান, শত্রুরা বন্দুক নিয়ে যাচ্ছে, তাদের যে-কোনওভাবে আটকে রাখুন ।" লুকান আদেশটা পেলেন, কিন্তু রাগ্লান যেসব বন্দুকের কথা বলেছিলেন সেগুলি দেখতে পেলেন না । তিনি ভাবলেন, রাগ্লান হয়তো উপত্যকার শেষে, লাইট ব্রিগেডের পূর্ব দিকের রুশ কামানগুলিকে নির্দেশ করেছেন । আসলে, এই উপত্যকার দু' দিকেই রুশ সেনারা, উপত্যকার শেষেও দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল গোলন্দাজ বাহিনী । ক্যাপ্টেন নোলান ব্যক্তিগতভাবে লুকানের শত্রু । সমস্ত অবস্থানটা ভাল করে দেখে লুকান মন্তব্য করলেন, "এটা শুধু মূর্খতাই নয়, আত্মহত্যাও বটে ।" নোলান বুঝতে পারলেন না, লুকান ভুল করেছেন । তিনি ক্রুদ্ধভাবে বারবার আক্রমণেরই নির্দেশ দিয়ে গেলেন, সুস্পষ্টভাবে কিছু ব্যাখ্যা করলেন না ।

লুকান কার্ডিগানের কাছে গেলেন এবং তাঁকে উপত্যকার নীচে আক্রমণের আদেশ দিলেন । কার্ডিগান খুব একটা দক্ষ যুদ্ধবাজ সেনানায়ক নন, তবু তাঁর কাছেও আদেশটা অদ্ভুত বলে মনে হল । তিনি বললেন, "আমাদের কিন্তু রাইফেল ও বন্দুকধারী একদল সৈন্যের মুখোমুখি এগোতে হবে ।" "জানি," লুকান উত্তর দিলেন, "কিন্তু এটা স্বয়ং সেনাপতির আদেশ ।" আর ব্যাখ্যার দরকার নেই । কার্ডিগান লাইট ব্রিগেডকে সামনে এগনোর আদেশ দিলেন । সেই মুহূর্তে নোলান বুঝলেন, গোটা আক্রমণ ভুল দিকে পরিচালিত হতে যাচ্ছে । তিনি হাত নেড়ে সঠিক দিক বোঝানোর চেষ্টা করতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই আচমকা একটা গোলা ফেটে তাঁর মৃত্যু হল । আক্রমণের আদেশ দেওয়া হয়নি, শুধুমাত্র এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । উপত্যকার তিনদিক থেকে ভেসে আসছে কামানের গোলা ও রাইফেলের বুলেটের ঝাঁক, তার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে লাইট ব্রিগেড । যেসব বন্দুকের কথা আদেশে বলা হয়নি, তারা তারই মোকাবিলা করতে এগিয়ে যাচ্ছে । সামনে এক বিশাল রুশ অশ্বারোহী সেনাবাহিনী । আর এগনো সম্ভব নয় ! কার্ডিগান সেনাদলকে পিছনোর আদেশ দিলেন । যুদ্ধ করতে করতে লাইট ব্রিগেড ফিরে এল তার নিজের জায়গায় । ৬৭৫জন সৈনিকের মধ্যে ১১৩জন মারা গেলেন, শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী ও আহত হলেন ১৩৪জন । ব্রিগেডের বেশির ভাগ ঘোড়াই মারা গেল । শুধুমাত্র মৃত্যুর সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়া এই আক্রমণে আর কোনও লাভ হয়নি । জেনারেল কার্ডিগান সেই রাত্রেই তাঁর নিজস্ব নৌকোয় করে বালাক্লাভা বন্দরে চলে গেলেন । কার্ডিগান মনে মনে নোলানকে অভিশাপ দিতে লাগলেন, "বোকাটা কিস্যু বোঝে না, সবকিছু খালি গুলিয়ে ফেলে ।" এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকেই অমর করে রেখেছেন লর্ড টেনিসন তাঁর 'দ্য চার্জ অব দ্য লাইট ব্রিগেড' কবিতায় । যুদ্ধের দুই নায়ক তাঁদের স্বনামে আজও অমর হয়ে আছেন । আজও আমরা 'রাগ্লান জামার হাতা' এবং 'কার্ডিগান পুলওভার' ব্যবহার করি ।

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) একটি ক্রিকেট-পত্রিকা সম্প্রতি বের হয়েছে । এই পত্রিকা পরিচালনা করেন শুধু ক্রিকেটাররা । পত্রিকা ও তার সম্পাদকের নাম কী ? **সৌগত মাহিন্দার**, সালকিয়া ।

(২) কোন বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু 'অ্যালবাট্রস' নামে পরিচিত ? **নীলেশ ব্যানার্জি**, কলকাতা-৮২ ।

(৩) সিংহের বৈজ্ঞানিক নাম কী ? **জয়দীপ ভৌমিক**, বালুরঘাট ।

(৪) কোন পিতা-পুত্র একই সালে, একই বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পান ? **কৌশিক দাস**, সোদপুর হাই স্কুল ।

(৫) সাধারণ তাপমাত্রায় কোন কোন ধাতব ও অধাতব মৌল তরল ? **স্বপন মালাকার ও জলধর দত্ত**, বেলডাঙা ।

(৬) 'Pygmalion' কার লেখা ? **শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি**, ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস হাই স্কুল, যশোর রোড ।

(৭) 'মাধবীকঙ্কণ' ও 'বঙ্গবিজেতা' বই দুটির লেখক কে ? **অঙ্কুর চৌধুরী**, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদা ।

(৮) কোন টিভি সিরিয়াল জাতীয় সংহতির বিষয়ে শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে ৩৫তম নার্গিস দত্ত পুরস্কার পেয়েছে ? **অলোক চক্রবর্তী**, ঝাড়গ্রাম ।

(৯) 'সোয়াহিলি' কোন দেশের জাতীয় ভাষা ? **সৈকত হাজরা**, সালকিয়া ।

(১০) 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি' কার লেখা ? **দীপশিখা মুখার্জি**, বাঁকুড়া ।

(১১) কর্ণের পুত্রের নাম কী ? **কিংশুক মহান্তি**, ঝাড়গ্রাম ।

(১২) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম কোনটি ? **শঙ্কর পাল**, কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর ।

(১৩) ফ্রান্সের মুদ্রার নাম কী ? **সন্দীপ হালদার**, পুরুলিয়া ।

(১৪) ১৯৮৯-র উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান (পুরুষদের বিভাগে) কে ? **কৌশিক তপাদার**, সোদপুর ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) নিকোলাস কোপার্নিকাস ।
(২) ডাকার ।
(৩) বেলজিয়ামের ফ্লোরেন্স ।
(৪) আউইতা এক্সপ্রেস ।
(৫) কায়রো ।
(৬) Dravida Munnetra Kazhagam.
(৭) অদাহ্য ।
(৮) মধু দণ্ডবতে ।
(৯) কায়রো ।
(১০) Tamil United Liberation Front.
(১১) 'Fire and Fear'.
(১২) ওয়েস্ট ইন্ডিজ ।
(১৩) ডেভিড কনস্টান্ট ।
(১৪) এর পাঁচটা শাখা বলেই এই নামে পরিচিত ।
(১৫) গোষ্ঠ পাল ।
(১৬) জুলফিকার আলি ভুট্টো ।
(১৭) অ্যাপোলো ।
(১৮) চিয়াও ।
(১৯) সময় ।

জুলফিকার আলি ভুট্টো

আউইতা

গোষ্ঠ পাল

কায়রোর একটি দৃশ্য

কুইজ

বিষয় : আয়ারল্যান্ড

প্রশ্ন

(১) আইরিশরা আয়ারল্যান্ডকে কী বলেন ?
(২) 'আয়ারল্যান্ড' শব্দের অর্থ কী ?
(৩) ভারতীয় এবং আইরিশ জাতীয় পতাকায় একই রং থাকে । কিন্তু, এই দুই পতাকায় পার্থক্য কী ?
(৪) আয়ারল্যান্ডের প্রধান ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মগুরু কে ?

স্যামুয়েল বেকেট

(৫) আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন শহরে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দু'জন নাট্যকারের জন্ম হয়েছিল । তাঁদের নাম কী ?
(৬) 'সবুজ ও কমলা রেখা' কোথায় অবস্থিত ?
(৭) ভেড়ার মাংস, আলু ও পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি জনপ্রিয় খাবারটির নাম কী ?

(খ)

প্রশ্ন

(ক) বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার । নাম কী ?
(খ) আয়ারল্যান্ডের এই কবি পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার ।
(গ) ইনিও আইরিশ । বিখ্যাত অভিনেতা ।

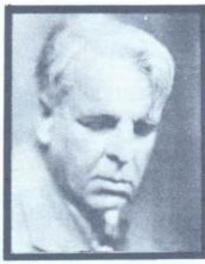

(ক)

(গ)

ছবির পরিচয় : (ক) অসকার ওয়াইল্ড । (খ) ডবলিউ বি ইয়েট্স । (গ) পিটার ওটুল ।

লোকসভা ভবন, আয়ারল্যান্ড

ডাবলিন শহরের একটি দৃশ্য

(৮) আয়ারল্যান্ডে কাকে 'প্যাডি' বলে ?
(৯) 'ওয়রেথ্টাস' কাকে বলা হয় ?
(১০) ১৮৪৫-'৪৬ সালে আয়ারল্যান্ডে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল । কোন শস্য উৎপাদনে ব্যর্থতা এই দুর্ভিক্ষের কারণ ?
(১১) আইরিশ ভাষার আর-একটি নাম কী ?
(১২) কোন গাছ আয়ারল্যান্ডের প্রতীক ?
(১৩) 'আইরিশদের শাই লা লা' কাকে বলে ?

(১৪) ও ব্রায়ান, ও কোনোর ইত্যাদি আইরিশ পদবিতে 'ও' শব্দের অর্থ কী ?
(১৫) ডাবলিন শহরে আয়ারল্যান্ডের বিখ্যাত থিয়েটার-হলটি অবস্থিত । তার নাম কী ?
(১৬) হকি কিংবা লাক্রোস খেলার মতো, আয়ারল্যান্ডে বল এবং লাঠি দিয়ে একটা খেলার প্রচলন আছে । এটি বহুদিন ধরে আয়ারল্যান্ডের অবসর বিনোদনের জাতীয় খেলা হিসেবে পরিচিত । খেলাটির নাম কী ?
(১৭) 'ফিয়ানা ফেইল' এবং 'ফাইন গেল' এই দুটি শব্দের মধ্যে সম্পর্ক কী ?

উত্তর : (১) আইয়ার । (২) আয়ার-এন-ল্যান্ড বা পশ্চিমের দেশ । (৩) ভারতের জাতীয় পতাকায় ওপর থেকে নীচ অবধি পরপর অনুভূমিকভাবে গেরুয়া, সাদা ও সবুজ এই তিনটি রং থাকে । আয়ারল্যান্ডের জাতীয় পতাকায় সবুজ, সাদা এবং হলুদ রং পাশাপাশি থাকে । (৪) সন্ত প্যাট্রিক । (৫) জর্জ বার্নার্ড শ এবং স্যামুয়েল বেকেট । (৬) বেলফাস্ট নগরীর প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক অংশ এই রেখা দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে । (৭) আইরিশ স্টু । (৮) যে-কোনও আইরিশকে । সন্ত প্যাট্রিকের নাম থেকে এই শব্দের উদ্ভব । (৯) আয়ারল্যান্ডের লোকসভা । (১০) আলু । (১১) গেলিক । (১২) ত্রিপত্র বা লবঙ্গ । (১৩) ওক কাঠের তৈরি মুগুর । (১৪) বংশধর । (১৫) অ্যাবে থিয়েটার । (১৬) হার্লিং বা হার্লে । (১৭) দুটিই আয়ারল্যান্ডের দুই রাজনৈতিক দলের নাম । (১৮) এয়ার লিঙ্গাস । (১৯) আইরিশ পাউন্ড ।

সন্ত প্যাট্রিক

(১৮) আয়ারল্যান্ডের জাতীয় বিমান পরিবহণ কম্পানির নাম কী ?

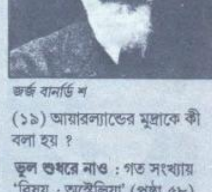

জর্জ বার্নার্ড শ

(১৯) আয়ারল্যান্ডের মুদ্রাকে কী বলা হয় ?

ভুল শুধরে নাও : গত সংখ্যায় 'বিষয় : অস্ট্রেলিয়া' (পৃষ্ঠা ৫৮) অংশে 'কিসের ছবি' প্রশ্নের (ক) এবং (খ) যথাক্রমে (খ) এবং (ক) পড়তে হবে ।

গাবলু
আলো
বাতাস
দরজা
ডালমুট
ডঃ আঁখি সর্বজ্ঞ
চক্ষুবিশেষজ্ঞ
শেষ
লাইনটি
পড়তে পারলে
তুমি একটি ললিপপ
পুরস্কার পাবে
2-26
ওর চোখে কোনও অসুখ নেই
আর বোধবুদ্ধি চমৎকার!

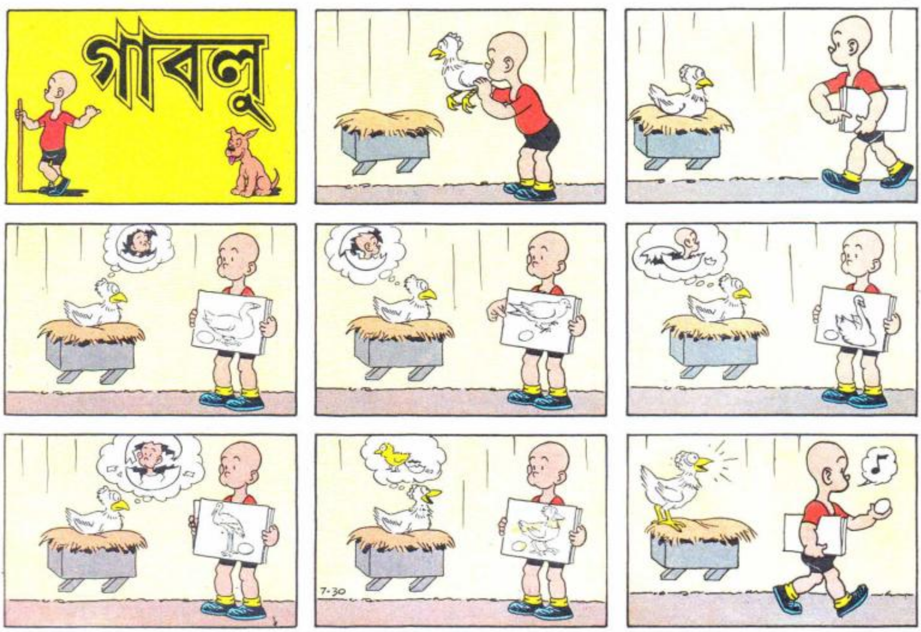
গাবলু
7-30

ধরনীর খোঁজে

অদ্রীশ বর্ধন

"আপনার নাম ?"

"সুযোধন চোপদার ।"

"সুযোধন ?"

"আজ্ঞে ।"

"মানে কী সুযোধনের ?"

"দুর্যোধন ।"

"সুযোধন মানে দুর্যোধন !"

"সুযোধনের আর-একটা নাম দুর্যোধন । যুধিষ্ঠির এই নামেই ডাকতেন দুর্যোধনকে ।"

"মহাভারতটা ভালই পড়েছেন দেখছি ।"

"ওইটুকুই আমার বিদ্যে," বলে কাষ্ঠহাসি হাসলেন সুযোধন চোপদার ।

ইন্দ্রনাথ বললে, "খুব বিপদে না পড়লে আমার কাছে কেউ আসে না । বিশেষ করে এত সকালে । বিপদটা আপনার নিজের তাই না ?"

"আজ্ঞে..." ঢোক গিললেন সুযোধন ।

"কী হয়েছে ?"

কথার সুরে এমন কিছু একটা ছিল, যা সুযোধনের অন্তর ছুঁয়ে গেল । ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন । ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে ইন্দ্রনাথের হাত খামচে ধরে বললেন, "ইন্দ্রনাথবাবু, আমার ফাঁসি হবে । বাঁচান আমাকে ।"

ভয়-ব্যাকুল গুলি-গুলি চোখ দুটোর দিকে খানিক চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ । তারপর বলল, "কী করেছেন ?"

সুযোধন তখন যা বললেন, তা এই :

গোলকুণ্ডা শহরে সবচেয়ে খাটিয়ে মানুষটার নাম কিরণ চোপদার । নিজের বাড়ির সামনের দিকের চালায় একটা পেট্রলপাম্প, খুব কাছেই অন্য একটা বাড়িতে চুটিয়ে চালাচ্ছে মিনি সুপারমার্কেট । দোকানঘরের ওপরের তলায় রেখেছে খানকয়েক ঝলমলে ঘর । রকমারি কাজের ঝকমারিতে ওকে সাহায্য করে স্ত্রী চন্দনা । একসময়ে প্রসূতিসদনের নার্স ছিল । মানে, ধাইমা । কিরণের বউ হওয়ার পর তাদের ছেলে ধরণীকে মানুষ করেছে । ধরণী এখন এই শহরের সকলের চোখের মণি । যেমন ফুটফুটে, তেমনই দুরন্ত । বয়স মোটে সাড়ে পাঁচ ।

১৯৮৮-র ২১ নভেম্বরের সন্ধ্যা । চন্দনা তাকে পাউডার মাখিয়ে, চোখে কাজল টেনে দিয়ে, কোঁকড়া চুলে চিরুনি চালিয়ে শুইয়ে দিয়েছে ছোট্ট খাটে । মশারি খাটিয়ে দিয়ে পাশে বসে গল্প শুনিয়েছে, গান গেয়েছে ।

ধরণী ঘুমিয়ে পড়তেই রোজকার অভ্যেসমতো পা টিপেটিপে সরে এসেছে খাটের কাছ থেকে । শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আস্তে টেনে বন্ধ করে দিয়েছে তারের জাল লাগানো দরজা । স্প্রিং-লক ক্লিক করে লেগেছে পেছন ফিরতেই । ছুট্টে চলে এসেছে মিনি সুপারমার্কেটে । কিরণ যখন ঝাঁপ তোলে, চন্দনা তখন পাশে দাঁড়ায় । মিনিট পঁয়তাল্লিশ লেগেছিল জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে দোকান বন্ধ করতে । তারপর দু'জনে ফিরল বাড়িতে । দেখল, ধরণীর ছোট্ট খাটে ধরণী নেই ! নিশ্চয় নতুন দুষ্টুমি জুড়েছে পাজিটা । খাট থেকে নেমে লুকিয়ে রয়েছে বাড়ির মধ্যেই কোথাও । এরকম বজ্জাতি ওকেই মানায় । স্বাস্থ্য ভাল, যতক্ষণ জেগে থাকে, ততক্ষণ পাগল করে ছাড়ে মা'কে অথবা বাবাকে ।

সারা বাড়ি খুঁজে এল কিরণ আর চন্দনা । পাওয়া গেল না ধরণীকে ।

তা হলে হয়তো বিচ্ছুটা গেছে বাড়ির বাইরে । আশেপাশেই খেলা করছে ।

ছুটে বেরিয়ে গেল স্বামী-স্ত্রী । রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরল । প্রতিটি বাড়িতে খোঁজ নিল । কিন্তু গোলকুণ্ডা শহরের কোথাও পাওয়া গেল না দুরন্ত ধরণীকে ।

মুখ শুকনো করে যখন বাড়ি ফিরছে দু'জনে, তখন আসতে হয়েছিল বিশাল জলাটার পাশ দিয়ে । এই জলা কত গভীর অথবা আদৌ গভীর কি না কেউ তা জানে না । কাদা, পাঁক আর আগাছায় ভর্তি । কেউ নামে না ।

দামাল ধরণী জলায় পড়ে যায়নি তো ?

বাদলা এদের সঙ্গেই ঘুরছিল । ঝণ্টু আর ঘোঁতনাও ছুটে এল । এ-শহরে ধরণীকে ভালবাসে সকলেই ।

কিরণ আর চন্দনা জলার দিকে চেয়ে আছে দেখে বাদলা বলেছিল, "মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন । ধরু এখানে আসেনি ।"

ধরণীকে আদর করে সবাই 'ধরু' বলে ডাকত ।

কিডন্যাপিং শব্দটা বড় ভয়ঙ্কর শব্দ । গোলকুণ্ডার মতো শান্তির শহরে এ-শব্দটা স্বভাবতই কারও মাথায় আসেনি । দেবশিশুর মতো ধরুকে যে কোনও মানুষ-পিশাচ গায়েব করে মোটা মুক্তিপণ চাইতে পারে, এমনটা কিরণ অথবা চন্দনা কেউই ভাবতে পারেনি । এসব ব্যাপার ঘটে বড়-বড় শহরে বড়-বড় লোকেদের বেলায় । কিরণ আর চন্দনা ছাপোষা মানুষ । কে নেবে তাদের নয়নের নিধিকে ? অসম্ভব ।

কিন্তু অসম্ভব ঘটনাও যে ঘটতে পারে শান্ত শহর গোলকুণ্ডায়, তা পরিষ্কার হয়ে গেল খুব শিগগিরই ।

খালি বাড়িতে ফিরে এল কিরণ আর চন্দনা । কাঠের ফটকের সামনে আসতে-না-আসতেই দেখল, পাশের রাস্তা দিয়ে প্রায় দৌড়ে আসছে গোপা চোপদার, কিরণের বউদি ।

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কিরণ । বউদি তো কখনও এভাবে দৌড়োয় না । ফরসা মুখ ঘামে ভিজে গেছে এই শীতের রাতেও ।

কপালের লাল টিপ ধেবড়ে গেছে ঘামে। বিষম উত্তেজনায় চোখ দুটো কোটর থেকে প্রায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় এইটুকু দেখেই বুকটা ধক্ করে উঠেছিল কিরণ আর চন্দনার।

কী খবর নিয়ে আসছে বউদি? দাদা-বউদি থাকে প্রায় সিকি মাইল দূরে, বটেশ্বর রোডে। ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে নাড়ছে একটা ছেঁড়া কাগজ।

হাঁফাতে-হাঁফাতে বললে বউদি, "ঠাকুরপো, ঠাকুরপো, দরজার কড়ায় গোঁজা ছিল।"

কাঁপা হাতে কাগজটা টেনে নিয়েছিল কিরণ। বাদামি কাগজ, যে কাগজ দিয়ে ঠোঙা তৈরি হয়। ঠোঙা থেকেই একটা দিক টেনে ছিঁড়ে নিয়ে কী যেন তাতে লেখা হয়েছে। পেনসিল দিয়ে লেখা।

ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পড়ে গেল কিরণ:

> *"এখনও যদি কোনও চিঠি না পেয়ে থাকেন, চলে যান উত্তর গোলকুণ্ডার চণ্ডীতলায়। তুকারাম সামুই-এর বাড়িতে পাবেন চিঠি।"*

এ-চিঠির মানে কী, তা নিমেষে বুঝেছে কিরণ। ধেয়ে গেছে ফটক খুলে বাড়ির দরজার সামনে। গর্তটা চোখে পড়েছে তখনই।

মশা আটকানোর জন্য তারের দরজা বানিয়েছিল কিরণ। কাঠের দরজা ছাড়াও একটা তারের দরজা। স্প্রিংয়ের তালা লাগিয়ে নিয়েছিল। এ তালার সুবিধে এই যে, বাইরে থেকে টেনে পাল্লা বন্ধ করে দিলে লক এঁটে যায়, তখন চাবি না লাগালে খোলে না। কিন্তু ভেতর থেকে চাবি ছাড়াই খোলা যায়। সুপারমার্কেটে নতুন স্প্রিং-লক আসতেই শখ করে নিজের বাড়িতে বসিয়েছিল কিরণ।

সেই লক ভেতর থেকে খোলা হয়েছে বাইরে দাঁড়িয়ে। কাতুরি দিয়ে দরজার তার কাটা হয়েছে গোল করে, ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে তালা খুলেছে, দরজা খুলেছে, ধরুকে নিয়ে চলে গেছে।

কিন্তু কতদূরে আর যাবে? দৌড়োদৌড়ি করলে এখনও নিশ্চয় দুষ্টু ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনা যাবে।

তাই তিনজনেই প্রায় ছুটে চলে গিয়েছিল চণ্ডীতলায় তুকারাম সামুইয়ের বাড়িতে। সেখানেও দেখেছিল বন্ধ দরজার কড়ায় গোঁজা একটা বাদামি রঙের কাগজ। ঠোঙা-ছেঁড়া কাগজ।

মুক্তিপণের দ্বিতীয় চিঠি:

> *"ছেলে আমাদের কাছে। যা বলছি, তাই করবেন। পুলিশকে যদি খবর দেন, সিরিয়াল নম্বরের নোট দেন, এই চিঠি পুড়িয়ে না ফেলেন, ছেলেকে আর দেখতে পাবেন না।*
>
> *৫ টাকার নোট ১০০০, ১০ টাকার নোট ১০০০, ২০ টাকার নোট ৫০০, ৫০ টাকার নোট ৫০০, ১০০ টাকার নোট ৫০০—মোট এক লক্ষ টাকা একটা জুতোর বাক্সে ভরে এই রাস্তা ধরে চলে আসুন:*

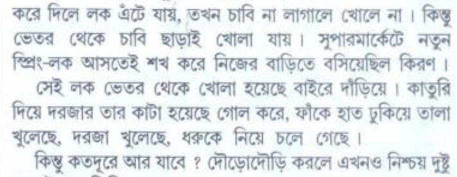

চিঠি গোঁজা ছিল যে বাড়ির কড়ায়, সেটা পাকাবাড়ি নয়। ঝুপড়ি বললেই চলে। হাবিজাবি জিনিস দিয়ে কোনও মতে ঢালু চাল বানিয়ে মাটি আর দরমার দেওয়ালে রাখা হয়েছে আলগোছে। দীনহীন এই নিকেতনের মালিকের নাম তুকারাম সামুই। জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে আর কাঠের কাজ করে পেট চালায়। রাত ন'টা নাগাদ তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজে। "কে রে," বলে ডেকে উঠতেই জবাব এসেছিল হেঁড়ে গলায়, "কড়ায় গুঁজে রেখে গেলাম একটা চিঠি। এক্ষুনি নিয়ে যা পেট্রলপাম্পের কিরণ চোপদারের কাছে। দশটা টাকা বখশিশ পাবি।"

ধড়মড় করে উঠে বসেছিল তুকারাম। স্মাগলারদের জ্বালায় এ-অঞ্চলে টেকা দায় হয়ে উঠল দেখছি। এই তো মাস কয়েক আগে হামলা চলছিল বাড়ির সামনে। তুকারাম বেরিয়েছিল রগড় দেখতে। শাঁ করে একটা বুলেট এসে বিঁধেছিল কাঁধে।

কাজেই আর ঝঞ্ঝাট নয়। হেঁড়ে গলায় কথা বলে লোকটা যে হন-হন করে চলে যাচ্ছে, তা নিস্তব্ধ রাতে স্পষ্ট শুনতে পেল তুকারাম। আওয়াজ অনেক দূরে মিলিয়ে যেতেই বউকে ঘুম থেকে জাগিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল ওই পাড়াতেই একজনের বাড়িতে। দরজার কড়ায় কী গুঁজে গেছে হেঁড়ে গলার লোকটা, তা সে দ্যাখেনি।

কিরণ, চন্দনা আর গোপার হাঁকডাক শুনে গুটি-গুটি বাড়ি ফিরে এসে সব বললে তুকারাম। আধবুড়ো নিরীহ মানুষ। ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে। ধরুকে সে যে ধরে আনেনি—এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

কিন্তু ধরুকে তো ফিরিয়ে আনতে হবে। মুক্তিপণ লাগুক, ধরুকে চাই।

কিডন্যাপারের কথার অন্যথা করেনি কিরণ। দুটো চিরকুটই পুড়িয়ে ফেলেছিল। পুলিশকেও খবর দেয়নি। সারজীবন হাড়ভাঙা খেটে কিরণ আর চন্দনা যা কিছু করেছিল, তার বিনিময়ে লাখখানেক টাকা জুটিয়ে নিয়েছিল সোমবার মাঝরাতের আগেই।

কালীতলা জায়গাটা ওর বাড়ি থেকে মাইল দশেক দূরে। জঙ্গলটার নাম ডাকাতে কালীর জঙ্গল। দু-একজন কাঠুরে ছাড়া ওদিক কেউ মাড়ায় না। জঙ্গলের মধ্যে কালীমন্দির এখনও আছে। গভীর রাতে সেখানে নাকি শাঁখ-ঘণ্টা বাজে। নিশ্চয় কেউ পুজো করে? শোনা যায়, ভাঙামন্দিরের কালীর কাছে যা চাওয়া যায়, তিনি তাই দেন।

একলক্ষ টাকার বাণ্ডিল জুতোর বাক্সে ঢুকিয়ে কিরণ আর চন্দনা সোমবার বিকেল নাগাদ গেল এই জঙ্গলে। বড় গভীর জঙ্গল। মন্দিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অনেক কষ্টে ভাঙামন্দিরে পৌঁছে রক্ত জল হয়ে গিয়েছিল দু'জনেরই।

মন্দিরের সামনে হাড়িকাঠে টাটকা রক্ত লেগে রয়েছে।

চারদিক পুরোপুরি নিস্তব্ধ নয়। পাখিরা গাছে ফিরছে। বড় চেঁচাচ্ছে। ডানা ঝটপট করছে। তালে-তালে ধুক-ধুক করছে দু'জনের হৃৎপিণ্ড।

সঙ্গে পুজোর সরঞ্জাম এনেছিল চন্দনা। মনে সাহস এনে ঢুকল ভাঙা ইট-পাথর মাড়িয়ে মন্দিরের মধ্যে। ফাটা দেওয়াল দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ভয়ঙ্কর কালীমূর্তি যেন গনগনে চোখে তাকিয়ে ছিলেন ওঁদের দিকে। সত্যিই জাগ্রতা দেবী। নইলে চাহনি অমন হয়?

ফুল-টুলগুলো নামিয়ে রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে বেদিতে মাথা ঠেকিয়ে কান্না জড়ানো গলায় বলেছিল চন্দনা, "মাগো, ধরুকে ফিরিয়ে দাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বড়-বড় হয়ে গিয়েছিল চন্দনার। অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল গলা চিরে।

চকচকে জিনসিটা একটা সোনার আংটি। আংটির পাথরটা একটা গোমেদ। গোমেদ-বসানো এই আংটি ছিল ধরুর আঙুলে!

বকুলতলায় গিয়ে কিন্তু টর্চের ফ্ল্যাশ দেখতে পায়নি কিরণ আর চন্দনা। ধরুকেও পায়নি।

দশমাইল পথ টলতে টলতে ফিরে এসেছিল দু'জনে। কাঠের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল নাচুভাই। কিরণের দাদা সুযোধন

চোপদারের পেট্রলপাম্পে কাজ করে। হাতে একটা বাদামি কাগজের ঠোঙা-ছেঁড়া কাগজ।

কিডন্যাপারের তৃতীয় চিঠি।

ফ্যাকাশে মুখে চিঠি হাতে নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে গেল কিরণ:

"একা যাবেন। অন্য রাস্তা ধরে আসবেন। ভোর চারটের সময়। পেছনে কেউ নিয়ে যাবেন না। বাক্সে সব টাকা রাখবেন। দু'বার ফ্ল্যাশ দেখলে দাঁড়াবেন।"

কিরণের ঠোঁট তখন কাঁপছে। চন্দনা পাথর হয়ে গেছে।

নাচুভাই বললে, "পেট্রলপাম্পে কুড়িয়ে পেলাম আমি আর কোকো।"

কোকো এই শহরেরই ছেলে। নাচুভাইয়ের বন্ধু। থাকে কিরণের বাড়ির পেছন দিকে। ধরুকে বড় ভালবাসে।

নাচুভাই বললে, "কাগজের উলটো দিকের নকশাটা দ্যাখো, কিরণদা।"

উলটে দেখল কিরণ। এবারের নকশায় নেড়ানেড়ি পাড়ায় যেতে বলা হয়েছে। অনেক রাস্তা আঁকা। তীরচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে কীভাবে কোন দিকে যেতে হবে।

বলল কিরণ, "আমি একাই যাব। নাচুভাই, কাউকে বলিসনি। কোকোকেও বলিসনি আমি যাচ্ছি, ও যা ছেলে, ঠিক পেছন-পেছন আসবে।"

সত্যিই তাই। গোলকুণ্ডা শহরে কোকো-র মতো ডাকাবুকো, লম্বা-চওড়া চেহারার মানুষ আর দুটি নেই। টকটকে ফরসা রং। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। মনটা কিন্তু ফুলের মতো নরম। পাঁচজনের উপকারে বুক দিয়ে পড়ে।

নাচুভাই বললে, "কোকো কিন্তু এ-চিঠি পড়েছে। রাগে ফুঁসছে। এল বলে তোমার কাছে।"

ঝটিতি বললে কিরণ, "তা হলে আমি যাই। চন্দনা, তুমি বাড়ি থাকো। কোকো এলে ওকে আটকে রাখবে। ভেবো না, ধরু ফিরবেই।"

অনেক ঘুরে, অনেক হেঁটে কিরণ যেখানে পৌঁছল, সে জায়গাটা বড়দা সুযোধনের পেট্রলপাম্পের কাছেই। গ্যারাজপাড়া থেকে যে রাস্তাটা গুদোম পাড়ার রাস্তার সঙ্গে কাটাকুটি করেছে, ঠিক সেইখানে।

দু'বার টর্চের ফ্ল্যাশ দেখা গেল এখানে। অন্ধকারে ডেকে উঠল একটা পেঁচা। অশথগাছের তলায় জুতোর বাক্সটা ছুঁড়ে দিল কিরণ। ফ্ল্যাশ দেখা গিয়েছিল ওইখানকার ঘুপসি অন্ধকারে।

ফিরে এল বাড়িতে।

কয়েক ঘণ্টা পরেও ফিরল না ধরু। কয়েকদিন পরেও না।

এই ক'দিন কিন্তু টগবগ করেছে কোকো। ধরু তার বড় প্রিয়। তার খেলার সঙ্গী। যে শয়তান ওকে নিয়ে গেছে, তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলতে চায় নিজের হাতে।

চন্দনা আর কথা বলে না। একদম বোবা। নাওয়া-খাওয়াও ছেড়েছে। এই সময়ে একটা অদ্ভুত খবর নিয়ে এল কোকো।

গোপাবউদিকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

পুলিশ সন্দেহ করেছে সুযোধনকে। সুযোধনের ব্যবসার অবস্থা ভাল নয়। যদিও গোলকুণ্ডা শহরে প্রথমে সে এসেছে, পেট্রলপাম্পও প্রথমে খুলেছিল, কিন্তু ছোটভাই তার পরে এসে একই কারবার করে লাল হয়ে গেল। সুপারমার্কেট খুলে এখন তার রমরমা দ্যাখে কে।

এই নিয়ে গোপাবউদির সঙ্গে প্রায় তুমুল ঝগড়া হত সুযোধনের। কাকচিল উড়ে যেত চেঁচামেচিতে।

তারপরেই নিখোঁজ হয়েছে গোপাবউদি। সুযোধনের হাত নেই তো এর ভেতরে?

তারপরের দিনই আগুনের মতো খবরটা ছড়িয়ে গেল গোলকুণ্ডা শহরে। সুযোধন চোপদার পালিয়েছেন গোলকুণ্ডা ছেড়ে।

কাহিনী শেষ করে জুলজুল করে চেয়ে রইলেন সুযোধন চোপদার। এমন শীতেও তাঁর টাকে ঘাম দেখা দিয়েছে। কালো মুখটা বিশাল কালো জামরুলের মতো চকচক করছে।

ঘরের এককোণে সোফায় শালমুড়ি দিয়ে বসে সব দেখলাম, সব শুনলাম আমি।

ইন্দ্রনাথ একদৃষ্টে সুযোধনের দিকে চেয়ে থেকে বললে, "পালিয়ে এলেন কেন?"

"নইলে ফাঁসি দিত। অমু-দারোগা নাকি বলেছে, গোপাকে আমি

খুন করেছি। ধরুকেও আমি সরিয়েছি। অথচ তখন আমি বাড়িতেই ঘুমোচ্ছিলাম।

"ধরুকে সরিয়ে আপনার লাভ ?"

"কিরণের মন ভেঙে দেওয়া। ওর দুটো ব্যবসায় যে ঠিক এক লাখ টাকা নগদে ঘুরছে, তা শুধু কাছের লোক ছাড়া কেউ জানে না। ওই এক লাখ ব্যবসা থেকে বের করে আনতে পারলেই ওর কারবার চুপসে যাবে, আমার কারবার ফুলে উঠবে।"

"আপনার স্ত্রীকে খুন করতে যাবেন কেন ?"

"মাথামোটা অমু-দারোগার বিশ্বাস, গোপা ছাড়া আর কে জানবে ধরুকে আমি সরিয়েছি ? তাই গোপার মুখবন্ধ করেছি ওকে খতম করে দিয়ে।"

"কিডন্যাপারের প্রথম চিরকুট কার বাড়ির দরজার কড়ায় গোঁজা ছিল ?"

"আমারই বাড়ির দরজায়।" গলা কেঁপে যায় সুযোধনের।

"তৃতীয় চিঠিটা কোথায় পেয়েছিল নাচুভাই ?"

"আমারই পেট্রলপাম্পে।"

"আ-প-না-র পেট্রলপাম্পে ?"

"আজ্ঞে," ঢোক গিললেন সুযোধন, "কোকো ট্রাক চালায়। জঙ্গলের কাঠ চালান দেয়। থাকে আমার বাড়ির পেছন দিকে একটা ছোট্ট ঘরে। খায়দায় হোটেলে। মাসের তিনভাগ বাইরে থাকে ট্রাক নিয়ে। আমার কর্মচারী নাচুভাই ওর বন্ধু। রাত্রে শখ করে ওর ট্রাকে ঘুমোয়। সেদিন রাত্রে ওকে ঘুম থেকে তুলে কোকো নিয়ে গিয়েছিল আমার পেট্রলপাম্পে পেট্রল নেওয়ার জন্য। চাবি থাকত নাচুভাইয়ের কাছে। পেট্রল দিতে দিতে নাচুভাই শুনেছিল অফিসঘর থেকে কোকো হেঁকে বলছে, 'এটা আবার কী ?' পেট্রল দেওয়া শেষ করে নাচুভাই গিয়ে দেখল কোকো রাগে ফুঁসছে। হাতে কিডন্যাপারের চিরকুট। বন্ধ দরজার তলা দিয়ে বদমাশটা ফেলে গিয়েছিল ঘরের মেঝেতে, কোকো দরজা খুলে ঢুকেই দেখেছে।"

"দরজার তলায় চৌকাঠ আছে ?"

"আজ্ঞে, তা আছে।"

"পাল্লা ভেতর দিকে খোলে, না বাইরের দিকে ?"

ভ্যাবাচাকা মুখে সুযোধন বললেন, "বাইরের দিকে।"

"ইঁদুর আছে বুঝি অফিসঘরে ?"

"না তো।"

"দরজার তলার কাঠ খেয়ে যায়নি ?"

"একেবারে না। অ্যালুমিনিয়াম পটি দিয়ে মোড়া। খাপে-খাপে লেগে যায় চৌকাঠে। ইঁদুরের সর্দারও ঢুকতে পারে না।"

"অফিসঘরের দরজায় কি তালা দেওয়া ছিল ?"

"আজ্ঞে, চাবি ছিল নাচুভাইয়ের কাছে।"

"টাকা ভর্তি জুতোর বাক্সটা যেখানে ছুঁড়ে এসেছিল কিরণ, সে জায়গাটাও আপনার বাড়ির কাছে ?"

ঠিক যেন ককিয়ে উঠলেন সুযোধন, "সার··· সার··· এই সবের জন্যই অমু-দারোগা আমাকে ধরবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ধরুকে আমি সরাইনি, গোপাকে আমি মারিনি। আমাকে বাঁচান।"

"কলকাতায় উঠেছেন কোথায় ?"

"শিয়ালদার এক হোটেলে।"

"আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?"

চমকে উঠলেন সুযোধন, "সে তো সার এই কলকাতাতেই, ঝামাপুকুরে।"

"ঠিকানা ?"

"সার··· সার···" প্রায় কেঁদে ফেললেন সুযোধন, "ওখানে খবর দেবেন না। গোপার ভাইটা একটা মস্তান। আমার লাশ ফেলে দেবে। শুধু পুলিশের ভয়ে নয় সার, পিন্টুর ভয়েই আমি পালিয়েছি বাড়ি ছেড়ে।"

"পিন্টু দে ?"

"আপনি চেনেন ?"

সুযোধনের কথার জবাব না দিয়ে আমার দিকে মুখ ফেরাল ইন্দ্রনাথ। বলল, "তুই যা, মৃগাঙ্ক।"

আর কিছু বলতে হল না আমাকে। কোথায় যেতে হবে, তা বুঝে গিয়েছিলাম।

আমি বেরিয়ে যেতেই নাকি নেতিয়ে পড়েছিলেন সুযোধন। হেঁচকি তুলেছিলেন।

হেঁচকি থামতেই সুযোধনের প্রথম প্রশ্নটা ছিল এই, "কেন পাঠালেন সার ? পিন্টু ঠিক লাঠি মারবে আমার মাথায় ?"

নিষ্করুণ গলায় ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিল, "অমু-দারোগার টেলিফোন আছে তো ?"

"টে-টে-টেলিফোন !"

"হ্যাঁ। থানায় ফোন আছে ?"

"সার ! সার ! ওখানেও খবর দেবেন ?" কেঁদে ফেলেছিলেন সুযোধন।

"নাম্বার জানেন ?"

হু-হু করে সুযোধন তখন কাঁদছেন। নাম্বারও গুলিয়ে ফেলেছিলেন। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ফোন করে নাম্বার জুটিয়ে নিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। তখনই ফোন করেছিল অমু-দারোগা অর্থাৎ অমিয় তরফদারকে।

পরের দিন একটা নাটক হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের বেলেঘাটার বাড়িতে।

বসবার ঘরের একদিকে সোফায় বসে চন্দনা, কিরণ আর অমু-দারোগা পলকহীন চোখে চেয়ে আছেন এদিকের সোফায় জবুথবু হয়ে বসে থাকা সুযোধনের দিকে। ভদ্রলোক পোড়া বেগুনের মতোই একেবারে চুপসে গেছেন। বিষম আতঙ্কে চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ইন্দ্রনাথ ওঁকে সারাদিন সারারাত ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেখেছিল—পাছে পালিয়ে যান, এই ভয়ে।

এমন সময়ে জুতো মসমসিয়ে ঘরে ঢুকলাম আমি। আমার

পেছনে পিণ্টু-মস্তানের তালঢ্যাঙা বপু দেখেই আঁতকে দাঁড়িয়ে উঠলেন সুযোধন। তারও পেছনে ধরুকে কোলে নিয়ে গোপা ঘরে ঢুকতেই সবেগে উঠে দাঁড়াল কিরণ আর চন্দনা।

কড়া গলায় অমু-দারোগা বললেন, "এই নাটকটা করার দরকার ছিল কি? টেলিফোনে বললেই তো হত?"

পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ইন্দ্রনাথ বললে, "তাতে জিনিসটা এত সহজে বোঝানো যেত না।"

"কিছুই তো বুঝলাম না মশাই।"

"একটা জিনিস তো বুঝেছেন, সুযোধন চোপদার নির্দোষ?"

"আপনি বুঝলেন কী করে?"

"এই ঘরে বসেই মনের চোখে ঘটনাগুলো দেখতে পেয়েছিলাম বলে। অমিয়বাবু, কিডন্যাপারের চিঠি প্রথমবারে সুযোধনবাবুর বাড়ির দরজার কড়ায় গোঁজা ছিল। অদ্ভুত নয় কি? কিডন্যাপার কখনও নিজের বাড়িতে মুক্তিপণের কাগজ গুঁজে রাখে? তৃতীয় চিঠিটাও পাওয়া গেল তাঁরই পেট্রলপাম্পে? আরও অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? টাকার বাক্সও ছুঁড়ে ফেলা হল তাঁর বাড়ির কাছে। আশ্চর্য, কাকতালীয়! প্রচণ্ড মনোবল থাকলে ঝানু কিডন্যাপার এইভাবে নির্দোষ সাজবার চেষ্টা করে। পুলিশ যেন ভাবে, নিশ্চয় কেউ তাকে ইচ্ছে করে ফাঁসাতে চাইছে কিন্তু সুযোধনবাবু ননীর পুতুল, এইরকম উৎকণ্ঠা তৈরি করে তার মধ্যে বেঁচে থাকার ক্ষমতা ওঁর নেই। তাই না সুযোধনবাবু?"

সুযোধন চোপদার হাসলেন। মেঘ কেটে যাওয়ার পর ঝকঝকে আকাশের হাসি।

ইন্দ্রনাথ বললে, "তা হলে এমন কেউ সুযোধন চোপদারকে ফাঁসাতে চাইছে, যে কিরণ চোপদারের কাছের লোক, তাঁর ব্যবসায় ঠিক লাখ টাকা নগদে ঘুরছে—এ খবর জানে, ধরু কখন একলা থাকে, সে-খবরও রাখে। সে কে?"

"কে সে?" হুঙ্কার ছাড়লেন অমিয় দারোগা।

"তার মনোবল প্রচণ্ড। টেনশন সইবার ক্ষমতা সাঙ্ঘাতিক। সে কীভাবে নিশ্চিত হয়েছিল যে, সুযোধনবাবুর পেট্রলপাম্পে তৃতীয় চিরকুট ফেলে দিলে ভোর রাতের আগেই তা কিরণবাবুর হাতে পৌঁছবেই?"

চোখ বড়-বড় হয়ে ওঠে অমু-দারোগার, "ও মাই গড!"

"কে আগে দেখেছিল তৃতীয় চিরকুট?"

"কোকো।"

"দরজার তলায় অ্যালুমিনিয়াম পট্টি লাগানো—চৌকাঠে খাপে-খাপে বসে যায়। তার ফাঁক দিয়ে চিরকুট ঢুকিয়ে ঘরের মেঝেতে কি ফেলা যায়? যায় না। তা হলে, কিডন্যাপারই দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পকেট থেকে চিরকুট বের করে হাতে নিয়ে নাচুভাইকে ডেকেছে।"

"কোকো!"

"হ্যাঁ, কোকো। দুর্দান্ত ছোকরা কোকো। ট্রাকের ব্যবসায় নিশ্চয় নতুন ট্রাক কেনার ফিকিরে ছিল—খোঁজ নিলেই জানবেন। তাই এক লাখ টাকা বাগানোর এই পরিকল্পনা করে। ধরুর মা বেরিয়ে যেতেই তারের জাল কেটে ঘরে ঢুকেছিল। ধরুর মুখে তোয়ালে জড়িয়ে মুখ টিপে ধরে ছুটে পালিয়ে যেতে যেতে যখন বুঝল, ধরু আর গোঙাচ্ছে না, নড়ছে না, তখন ভেবেছিল তোয়ালের চাপে বোধহয় দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে। না, মারা যায়নি। কোকো কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে ডাকাতেকালীর জঙ্গলে ওর দেহ ফেলে দিয়ে পালায়।"

"তারপর?" উদগ্রীব হয়ে বসেছেন অমু-দারোগা।

"তারপরের ঘটনা কি গোপা চোপদার বলবেন?" বললে ইন্দ্রনাথ।

"আপনিই বলুন," ধরুর গাল টিপে দিয়ে চোখ নামিয়ে বললেন গোপা।

"বেশ, আমিই বলছি। ছেলেপুলের জন্য মানত করতে উনি গিয়েছিলেন ডাকাতেকালীর জঙ্গলে। হঠাৎ দেখতে পেলেন ঝোপের মধ্যে পড়ে রয়েছে ধরু। ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। ধরু যে এখনও বেঁচে আছে, এটা যদি কিডন্যাপার জানতে পারে, তা হলে আবার ধরু গায়েব হতে পারে—এই ভয়ে তাকে লুকিয়ে রাখবেন ঠিক করেন। আসবার আগে মা-কালীর সামনে গিয়ে প্রণাম করার সময়ে ধড়ফড় করার ফলে ধরুর আঙুলের গোরুর চোখ খুলে পড়ে যায় মায়ের পায়ের তলায়।"

"গোরুর চোখ?" অমু-দারোগার প্রশ্ন।

"গোমেদ। মানে, গোরুর চোখ। সেই পাথর বসানো আংটি দেখেছিলেন ধরুর-মা। হাড়িকাঠে রক্ত দেখে ধরে নিয়েছিলেন ধরু আর নেই। কিন্তু উনি এটা ভাবেননি যে, রক্তটা পাঁঠাবলির রক্ত হতে পারে।"

"আপনি কেন ভাবলেন?"

"ভাবলাম এই কারণে যে, সুযোধনবাবুই বলেছিলেন, ওঁর স্ত্রী ছেলেপুলের জন্য মানত করতে মন্দিরে গিয়েছিলেন। সে মন্দির তো ও অঞ্চলে এই ডাকাতেকালীর মন্দির। গোপা চোপদার কি তা হলে ধরুকে নিয়েই সটকান দিয়েছেন? ধরুকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার জন্য? তাই মৃগাঙ্ককে পাঠালাম ওঁর বাপের বাড়িতে। সেখানেই বহাল তবিয়তে পাওয়া গেল ওঁদের। কী হে পিণ্টু, তুমি নাকি জামাইবাবুর মাথায় লাঠি মারতে চাও?"

"কে বলেছে?" বুক চিতিয়ে বললে পিণ্টু-মস্তান।

স্বর্গীয় হাসি হেসে বললেন সুযোধনবাবু, "আরে, ওটা একটা রসিকতা। খেপে যাচ্ছ কেন?"

কোকো ধরা পড়েছিল। অমু-দারোগার ঠেঙানি খেয়ে সব কবুল করেছিল। যে পেনসিলে চিরকুটগুলো লিখেছিল, সেই পেনসিল আর বাদামি কাগজের একগাদা ঠোঙা ওর ঘরেই পাওয়া গিয়েছিল। সেই সঙ্গে জুতোর বাক্স-ভর্তি এক লাখ টাকা।

তা থেকে একটা একশো টাকার বাণ্ডিল ইন্দ্রনাথের হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে কিরণ আর চন্দনা।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

চিলড্রেনস্ গিফ্ট গ্রোথ ফান্ড

একটি বিনিয়োগ ৫ বছর অন্তর বোনাস ডিভিডেন্ডের সাথে যা ১২ গুণ অব্দি বাড়ে।

ঠিক এর জন্যই আপনি অপেক্ষা করছিলেন। **চিলড্রেনস্ গিফট্ গ্রোথ ফান্ড** এমনিই এক প্রকল্প যা প্রিয় শিশুটির প্রতি আপনার যত্ন ও ভালবাসাকেই প্রকাশ করে।

এই প্রকল্পে আছে বছরে ১২·৫% হারে সুনিশ্চিত ডিভিডেন্ড যা আপনা থেকেই মূল বিনিয়োগের সাথে প্রতি বছর যোগ হয়। যার মানে হ'ল আপনার উপহারটি ২১ বছরে ১২ গুণ হয়ে যায়। এবং এছাড়াও আছে – প্রতি ৫ বছরে **বিশেষ বোনাস ডিভিডেন্ড।**

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য :

- যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক – পিতামাতা, স্বজন বা শুভাকাঙ্খী – ১৫ বছরের নীচে যে কোন শিশুকেই এই উপহার দিতে পারেন।
- এই উপহার শিশুটির ২১ বছর বয়সে পূর্ণতা লাভ করে। ১৮ বছর বয়সে ভাঙ্গিয়ে নেওয়ারও এক বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তার আগে মূল বিনিয়োগ অথবা ডিভিডেন্ড কোনটাতেই কেউ হাত দিতে পারবেন না।
- উপহার কর ছাড় ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত।
- কেবল জুন মাসে হিসাব মিলাবার সময় ছাড়া,ইউনিট প্রতি ১০ টাকা সমহারে এই প্রকল্পটি সারা বছরই চালু থাকে।

অনুগ্রহ করে আমাকে বিনামূল্যে একটি সি জি জি এফ পুস্তিকা পাঠান

নাম ....

ঠিকানা ....

পিন কোড ....

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)

প্রধান কার্যালয় : ১৩, স্যার ভিঠলদাস থ্যাকারসে মার্গ (নিউমেরিন লাইনস্), বোম্বাই-৪০০ ০২০ ফোন : ২৮৬৩৭৬৭

আঞ্চলিক কার্যালয় : ২ ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১। ফোন : ২০৯৩৯১, ২০৫৩২২

শাখা কার্যালয় : আশা নিবাস, ২৪৬ লুইস রোড, ভুবনেশ্বর ৭৫১০১৪। ফোন : ৫৬১৪১
জীবন দীপ, এম এল নেহেরু রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১। ফোন : ২৩১৩১
জীবন দীপ বিল্ডিং, এগজিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১। ফোন : ২২২৪৭০

Sista's-UTI-090 BEN-R

টাকাকড়ি

বেনি-হাসানে আবিষ্কৃত প্রাচীন মিশরের এক ভিত্তিচিত্রে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে স্বীকৃত এক ধাতুতে প্রস্তুত কিছু বস্তু দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করার দৃশ্য

টাকার জন্ম : দ্বিতীয় পর্ব

দেশে-দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে টাকার জন্ম হয়েছিল, জানিয়েছেন **ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

মিশরের থিব্‌সে আবিষ্কৃত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর এক চিত্রে দেখা যায় যে, সোনার আংটি ওজন করা হচ্ছে, হয়তো বা বিনিময়ের হিসাবে দাম দেওয়ার জন্য। এইরকম দৃশ্য মিশরের অনেক প্রাচীন ভিত্তি-চিত্রে দেখা যায়। বর্তমানে লেনিনগ্রাদে রক্ষিত প্যাপিরাসের উপর লিখিত এক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ওয়েন-আমন নামে এক ব্যক্তি কলসি ও বস্তা-ভর্তি সোনা-রুপা নিয়ে দূর দেশে গিয়েছিল কেনাকাটার জন্য। কেনাবেচার জন্য ব্যবহারযোগ্য সোনা ও রুপার পিণ্ড এবং রুপার আংটি মাটির পাত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের তেল এল—আমরনা থেকে। ওজন করার জন্য প্রয়োজনীয় দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারার ছবিই শুধু নয়, আসল বস্তুরও সন্ধান মিলেছে কয়েক জায়গায়। এই প্রসঙ্গে সিরিয়ার সীমানাভুক্ত প্রাচীন উগরিত শহরে আবিষ্কৃত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর ব্রোঞ্জের তৈরি দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারাগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

যেসব দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হত সেগুলিকে সমষ্টিগতভাবে আমরা দ্রব্যধন বা অর্থ বলে অভিহিত করতে পারি। এদের আদান-প্রদান করার রীতিকে দ্রব্যধন বিনিময় প্রথা বলা যেতে পারে।

কিন্তু এই ধরনের প্রথার কয়েকটি অসুবিধা ছিল, যেমন বারেবারে দ্রব্যধনের ওজন করা এবং দাম দিতে গেলে ওজনের মান ও কিনবার জিনিসের দাম অনুযায়ী দ্রব্যধনকে ভাগ করা বা (সোনা-রুপার ক্ষেত্রে) খণ্ড খণ্ড করে কাটা। এই বিরক্তিকর ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা হল রুপার বা গ্রহণযোগ্য অন্য কোনও ধাতুর খণ্ডগুলিকে নির্দিষ্ট ওজনে কেটে নিয়ে বাজারে চালু করা। খুব সম্ভবত এটা করা হত

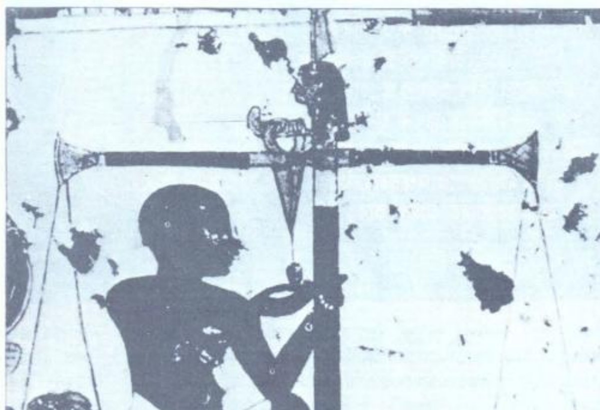

প্রাচীন গ্রিসের থিব্‌সে আবিষ্কৃত এক চিত্রে এক ব্যক্তিকে দাঁড়িপাল্লায় কিছু সোনার আংটি ওজন করতে দেখা যাচ্ছে

কোনও (প্রশাসনিক বা বাণিজ্যিক) কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে, যাতে খণ্ডগুলির ওজন ও মান ঠিক থাকে। যে-কোনও ব্যক্তি খুশিমতো এই ধরনের রুপার খণ্ড বাজারে চালু করার অধিকারী হলে, খণ্ডগুলির ওজনে বা রুপার পরিমাণে কারচুপি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেত। বিভিন্ন তৌলরীতি অনুযায়ী প্রস্তুত খণ্ডগুলির বিনিময় মূল্য হত সমপরিমাণ ধাতুর বাজার দামের সমান। অবশ্য গলানো রুপা ছাঁচে ঢেলে খণ্ড তৈরির আগে এর সঙ্গে কিছু খাদ যোগ করতে হত, যাতে খণ্ডগুলি শক্ত হয়। এইজন্য যেটুকু খাদ থাকত তার দাম ওই পরিমাণ রুপার চেয়ে কম হত। ওই পার্থক্য কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে তৈরি খণ্ডগুলি ব্যবহারের অনেক সুবিধার কথা মনে করে লোকে মেনে নিত। যেখানে মানা হত না সেখানে নির্দিষ্ট ওজনের নিখাদ ধাতুচূর্ণ ছোট-ছোট থলিতে ভর্তি করে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত। তামার গুঁড়ো ভর্তি এই ধরনের থলির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে প্যালেস্টাইনের বেথ-শান অঞ্চলে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষভাগের কিছু নিদর্শন থেকে। অন্যদিকে উগরিত শহরে আবিষ্কৃত আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের বেশ কয়েকটি লেখ-এ বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য হিসাবে যেসব রৌপ্য শেকেলের কথা লেখা হয়েছে, সেগুলি নিশ্চয়ই ধাতুখণ্ড (চূর্ণ নয়)। একটি লেখ-এ ৩০০০ শেকেল এক ট্যালেন্টের ওজন বা মূল্যের সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাহরিন দ্বীপে আবিষ্কৃত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর এক পাত্রে এবং ইরানের নুষ-ই জানে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর এক তামার পাত্রে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অনেকগুলি রুপার খণ্ড পাওয়া গেছে। নির্দিষ্ট ওজনে তৈরি এই খণ্ডগুলি ধাতব বিনিময় মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত ছিল। বাইবেলে এই ধরনের রুপার খণ্ডের উল্লেখ আছে। এই ধর্মগ্রন্থের এক অংশে একটি জমির মূল্য লেখা হয়েছে চারশো শেকেল। এই শেকেল ছিল বণিকসমাজে প্রচলিত অর্থ (জেনেসিস, ২৩, ১৫-১৭)।

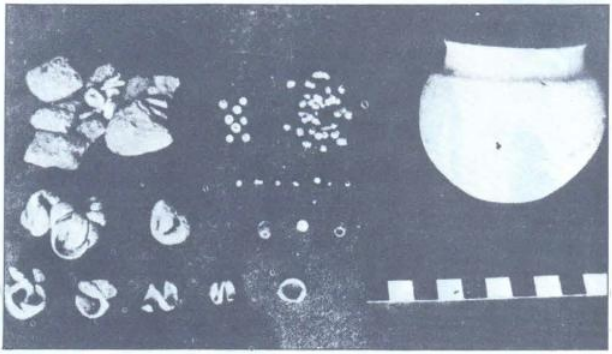

প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া এবং বর্তমানে ইরাকের সীমানাভুক্ত তেল-তায়াতে উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত পাত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন ওজন অনুযায়ী কাটা রৌপ্যখণ্ড

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাপ, ছবি বা তার নাম অথবা সবক'টি সমেত খণ্ডের নাম হল টাকা। সুতরাং টাকা বা মুদ্রা হচ্ছে একরকমের নির্দিষ্ট ওজনের ও কোনও কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিতবহ লেখ বা ছবিসমেত ধাতব খণ্ড। এই ইঙ্গিতবহ লেখ বা ছবি খণ্ডটির মূল্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয়, ব্যবহারকারীদের আশ্বস্ত করে।

এই ধরনের খণ্ডগুলি ব্যবহারের একটি অসুবিধা ছিল। কোনও কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে তৈরি হলেও কর্তৃপক্ষের ছাপ এগুলির উপর না থাকায় কেনাবেচার সময় এগুলিকে দেখে নিশ্চিত হওয়া যেত না এগুলির মান ও ওজন ঠিক আছে কি না। কোনও অসাধু লোকের পক্ষে নিজের ঘরে তৈরি সামান্য কম ওজনের বা ঠিক ওজন রেখেও নিম্নমানের ধাতুখণ্ড দিয়ে জিনিস কিনে বিক্রেতাকে ঠকানো সম্ভবপর ছিল। এই অশুভ সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য দ্রব্য বিনিময় হিসাবে ব্যবহৃত খণ্ডগুলিতে বিশ্বাসযোগ্য কর্তৃপক্ষের ছাপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই ছাপ সমন্বিত খণ্ডগুলিই টাকা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যেসব ধাতু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যেত সেগুলির সমষ্টিগত নাম, অর্থ। যেসব ধাতুখণ্ড নির্দিষ্ট ওজন ও মানে প্রস্তুত করে কোনও কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রচারিত হত সেগুলি ছিল ধাতব বিনিময় মাধ্যম। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাপ, ছবি অথবা তার নাম অথবা সবক'টি সমেত খণ্ডের নাম হল টাকা। সুতরাং টাকা বা মুদ্রা হচ্ছে একরকমের নির্দিষ্ট ওজনের ও কোনও কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিতবহ লেখ বা ছবিসমেত ধাতবখণ্ড। এই ইঙ্গিতবহ লেখ বা ছবি খণ্ডটির মূল্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয়, ব্যবহারকারীদের আশ্বস্ত করে।

অনেকে মনে করতে পারেন যে, যেসব প্রাচীন সমাজে ধাতব বিনিময় মাধ্যম প্রচলিত ছিল, সেগুলির সব ক'টিতেই পরে টাকার প্রবর্তন হয়। কিন্তু এই ধারণা ভুল। প্রাচীন মিশরের মতো সভ্য দেশ, ব্যাবিলনের মতো বাণিজ্য-প্রবণ অঞ্চল অথবা বিরাট আসুরীয় সাম্রাজ্য ধাতব বিনিময় মাধ্যম থেকে টাকা বা মুদ্রার স্তরে উত্তরণ করতে পারেনি। আবার যেসব প্রাচীন সভ্যসমাজে টাকার প্রচলন হয়েছিল সেগুলির সব ক'টিতেই তার আবির্ভাব একই সময় হয়নি। দেশে-দেশে টাকার জন্ম হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। (ক্রমশ)

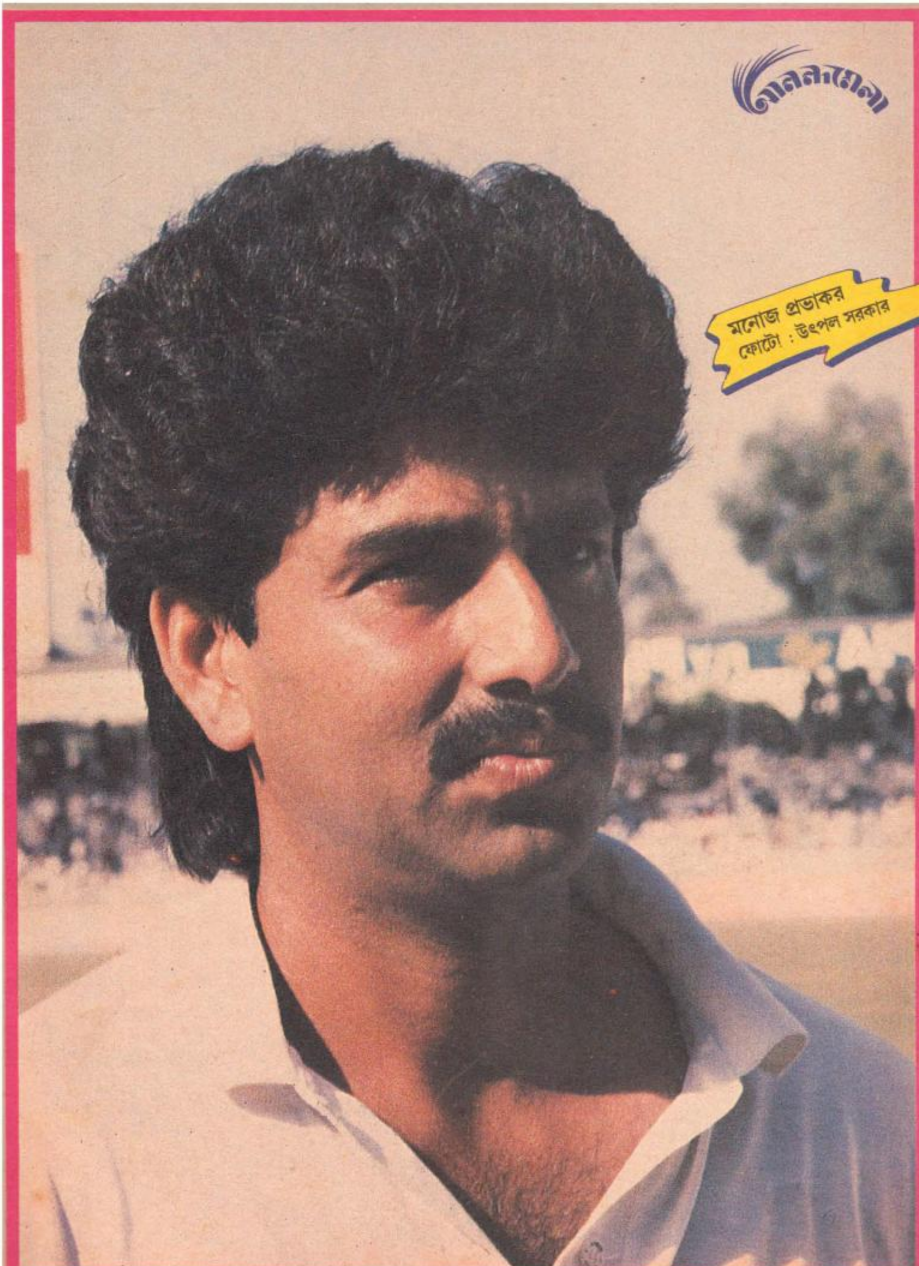
মনোজ প্রভাকর
ফোটো : উৎপল সরকার

আনন্দমেলা
ওয়াসিম আক্রম
ফোটো : উৎপল সরকার

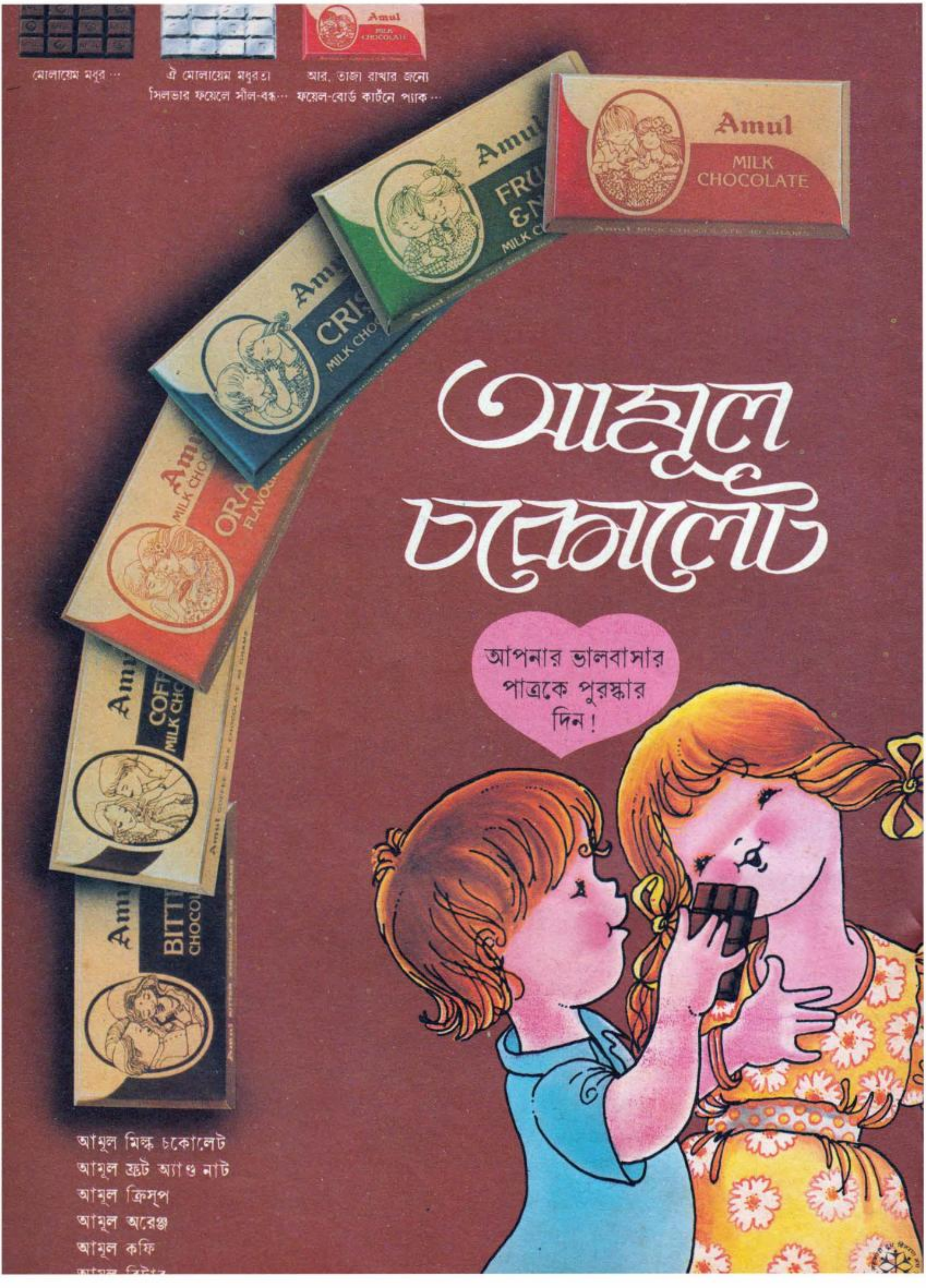

মোলায়েম মধুর …
ঐ মোলায়েম মধুরতা
সিলভার ফয়েলে সীল-বন্ধ…
আর, তাজা রাখার জন্যে
ফয়েল-বোর্ড কার্টনে প্যাক…
Amul
MILK
CHOCOLATE
আমূলে
চকোলেট
আপনার ভালবাসার
পাত্রকে পুরস্কার
দিন!
আমূল মিল্ক চকোলেট
আমূল ফ্রুট অ্যাণ্ড নাট
আমূল ক্রিস্‌প
আমূল অরেঞ্জ
আমূল কফি

খেলাধুলো

বিশ্বকাপ : চব্বিশজনের ঘুম নেই

কেন ? কারা এই চব্বিশজন ? **সন্দীপ বসুর** প্রতিবেদন

চব্বিশটি দেশের চব্বিশজন ভদ্রলোকের রাতের ঘুম বোধহয় এখনই চলে গেছে। বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে কয়েক মাস বাকি। তবু এই অবস্থা। এঁরা মাঠে নেমে ফুটবল খেলবেন না। কিন্তু এঁরাই ঠিক করে দেবেন তাঁদের দেশের ফুটবলাররা কীভাবে আক্রমণে যাবে, প্রতিপক্ষকে আটকাবে, কীভাবে বিপক্ষকে ধোঁকা দিয়ে গোল করে আসতে হবে। যত দিন যাচ্ছে ফুটবল ততই অত্যাধুনিক কলাকৌশলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এবং এসব কলাকৌশল ঠিক করছেন কোচেরা। বিশ্বকাপের চব্বিশজন কোচ এখন সেই পরিকল্পনায় ব্যস্ত। এঁদের অবশ্য কোচ বলা হয় না, বলা হয় ম্যানেজার। অর্থাৎ খেলোয়াড়দের সবকিছু দেখাশোনার ভার তাঁদের ওপর।

সবচেয়ে বেশি চিন্তা আর্জেন্টিনার কোচ বিলার্দোর। গত বিশ্বকাপ জয় করার ফলে একটা মানসিক চাপ তাঁর আছেই। তার ওপর, গত চারবছরে সেরকম কোনও প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসেনি। বুরুচাগা সেরকম ফর্মে নেই। একমাত্র নির্ভর

দাইস লিব্রেগট্‌স

অ্যাজেগলিয়া ভিসিনি

দিয়েগো মারাদোনা। পাঁচজন মিডফিল্ডার নিয়ে খেলবেন ঠিক করেছেন বিলার্দো। ফাইনাল পর্যায়ের গ্রুপ ভাগ নিয়ে অবশ্য খুশি তিনি। প্রথম ম্যাচে ক্যামেরুন-এর সঙ্গে খেলতে হবে। ইউরোপীয় দলগুলোর চেয়ে এটা ভাল। কারণ, তা হলে দর্শকদের প্রবল বিরোধিতার সামনে পড়তে হবে না।

ব্রাজিলের ম্যানেজার সিবাস্টিয়ো লাজারোনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, ফাইনালে তাঁরা যাবেনই এবং ইতালির সম্মুখীন হবেন। তবে একটা অসুবিধার কথাও তাঁর মনে হয়েছে। "গ্রুপের সবাই আমাদের জানে, আমরা কিন্তু কারও খেলাই জানি না।"

ইতালির অ্যাজেগলিয় ভিসিনির সমস্যা, নিজের দেশের দর্শকদের সামনে খেলার চাপ। সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে এর সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে। বিয়ারজোতের পদত্যাগের পরই গত চার বছর ইতালি দলের দায়িত্ব ভিসিনির।

সবচেয়ে ভাল দল পেয়েছেন হল্যান্ডের ম্যানেজার দাইস লিব্রেগট্‌স। গুলিট, মার্কো ভ্যান বাস্তেন, রিচকার্ড, কোয়েম্যান সবাই তারকা। লিব্রেগট্‌স বলেছেন, "গুলিট যদি সুস্থ থাকে তবে আমার রণনীতিতে জয় অনিবার্য।"

পশ্চিম জার্মানির কোচ ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের এটি দ্বিতীয় বিশ্বকাপ, কোচ হিসেবে। অভিজ্ঞ বেকেনবাওয়ারের প্রস্তুতি ভালই, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তাঁর দল এখন তৈরি। সোভিয়েত কোচ ভ্যালেরি লভেনভস্কি এবং ইংল্যান্ডের ববি রবসনও চমকে দিতে পারেন।

আশা জাগালেন জাগালো

দক্ষিণ কোরিয়ার পর এবার কি সংযুক্ত আরব আমিরশাহির পালা ? গত বিশ্বকাপে এশিয়াকে গর্বিত করার মতো খেলা খেলেছিল দক্ষিণ কোরিয়া। এবার তাঁরা তো আছেনই, আর একটি এশিয়ার দেশ হিসেবে আরব আমিরশাহিও ইতালিতে ফাইনাল পর্যায়ে খেলছে। তারা কি কিছু চমক দেখাবে ? অবশ্যই আশা করা যায় যেহেতু আছেন মারিও জোরজি জাগালো।

জাগালো তিনবার বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলে খেলেছেন। কোচ হিসেবে আরব আমিরশাহিতে যোগ দিয়েই তিনি খেলোয়াড়দের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন। সবাই ভেবেছিল দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়া কুয়েত, ইরাক অথবা চিন

মারিও জাগালো

এবার ইতালিতে যাবে। কিন্তু সব হিসেব উলটে দিলেন জাগালো। ক্ষুদ্র, অথচ ধনী এবং সদ্য ফুটবলে আকৃষ্ট এই দেশটিকে সম্পূর্ণ ব্রাজিলীয় স্টাইলে তৈরি করলেন তিনি। তরুণ খেলোয়াড়দের দলে নিলেন, প্রত্যেকের গড় বয়স তেইশ, প্রচণ্ড অনুশীলনে তাদের রপ্ত করালেন আধুনিক ফুটবলের কলাকৌশল এবং প্রত্যেকের মনের মধ্যে এনে দিলেন দেশের হয়ে কিছু করার আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষারই ফল ইতালিতে যাওয়া। ব্রাজিল দলের ছন্দোময় খেলা আমাদের সকলেরই পছন্দ। জাগালোর কোচিংয়ে 'এশিয়ার ব্রাজিল দল'ও নিশ্চই সেরকম খেলাই দেখাবে ইতালিতে।

ব্যাটসম্যানকে চাপের মধ্যে রেখে দেয় রাজদানের লড়াকু মনোভাব

তরুণ ফাস্ট বোলার বিবেক রাজদানের অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন **গৌতম ভট্টাচার্য**

মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ভেতর এম আর এফ পেস ফাউন্ডেশন ক্যাম্পের এককোণে দাঁড়িয়ে টি এ শেখর কথাটা বলেছিলেন।

শেখর ভারতের প্রাক্তন পেস বোলার। এক সময়ে মনে করা হত কপিল দেবের যোগ্য জুড়ি তিনিই হতে পারবেন। ১৯৮২-র পাকিস্তান সফরে শেখরকে পাঠানো হয়েছিল। সুযোগ পেয়েছিলেন গতবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের আগে কন্ডিশনিং ক্যাম্পেও। কিন্তু ভারতীয় দলে পাকা জায়গা করা, সে ব্যাপারটা কিছুতেই হয়নি। কেন হয়নি, সেটা জানাতে গিয়েই শেখর বলেছিলেন, "ভারতীয় দলে জায়গা রাখতে হলে বড় খেলোয়াড়দের তোষামোদ করে চলতে হবে। তাদের যদি হাতে রাখতে পারেন তা হলেই আপনি দলে সুযোগ পাবেন।" পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন রবিন সিংহ। মনে হল, তিনিও শেখরকেই সমর্থন করলেন। বললেন, "এ একটা অদ্ভুত দল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে দেখলাম, নতুন ছেলেদের মিষ্টি করে দুটো উৎসাহের কথাও কেউ বলে না।" নীল মারুতি ভ্যানে স্টার্ট দিতে দিতে শেখর বলেছিলেন, "আমার যা হওয়ার হয়ে গেছে, কিন্তু ভয় হয় আমার ক্যাম্পের ছেলেগুলোর জন্য। ওদের অবস্থা যেন আমার মতো না হয়।"

ফাস্ট বোলারদের জন্য মাদ্রাজে ডেনিস লিলির পরামর্শে যে ক্যাম্প চলছে শেখর হচ্ছেন সেখানকার এক নম্বর লোক। চিফ কোচ। ওঁর শিবিরের ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় কে, জিজ্ঞেস করায় প্রথমে ইতস্তত করছিলেন। ভাবছিলেন, যেহেতু তিনি গুরু, শিষ্যদের আলাদা করে বাছা ঠিক হবে না। পরে দুজনের নাম করলেন, রাজীব শেঠ এবং বিবেক রাজদান।

কেমন বোলার রাজদান? শেখর বললেন, "বড় বড় কথা আমি বলতে চাই না। তবে ছোট একটা প্রমাণ আপনাকে দিতে পারি। গত বছর উনিশ বছরের কমবয়সীদের যে ভারতীয় দল পাকিস্তানে গিয়েছিল তাদের পারফরম্যান্স খোঁজ নিয়ে দেখুন। পাকিস্তানের ফাস্ট বোলারদের চেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছে রাজদান। যাদের চেয়ে ও বেশি উইকেট পেয়েছিল তাদেরই একজন আজ পাকিস্তানের হয়ে খেলছে। ইমরানের উৎসাহ পেয়ে ওয়াকার ইউনুস আজ কোথায় চলে গেছে, আর রাজদান দেখুন কোথায়? রঞ্জি ট্রোফি পর্যন্ত ওর খেলা হয়নি।" এই কথোপকথন যে সময়ে—তখন সবে নেহরু কাপ শুরু হয়েছে এবং বিবেক রাজদানের নাম সাংবাদিক, মাদ্রাজের লোক, ক্রিকেটার, বোর্ড-কর্তা, নির্বাচক এম আর এফ-এর লোকজন মিলে হয়তো দেশের শ' পাঁচেক লোক জানেন।

পাকিস্তান সফরে ওঁকে দলে ঢুকিয়ে নেন রাজ সিংহ। প্রায় একার উদ্যোগে। এবং কী আশ্চর্য, ওখানে সফরের অর্ধেকটা হতে না হতেই একদিন ওঁর মুখে খেদোক্তি শুনলাম, "কবে যে লিলির সঙ্গে দেখা হবে!" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কেন, লিলিকে দিয়ে কী হবে?" রাজদান, "সারের কাছে কিছু 'টিপ্স' নিতাম। আমাদের সিনিয়াররা তো কিছু দেখিয়েই দেয় না।" রাজদানকে সবচেয়ে সাহায্য করতে পারতেন কপিল। কিন্তু কপিল কখনওই আগ বাড়িয়ে সাহায্য করার পক্ষপাতী নন। ওঁর নীতি হচ্ছে, তোমাকে আমার কাছে এসে সাহায্য চাইতে হবে। তবেই আমি সমস্যাটা নিয়ে ভাবব। রাজদান যাননি কপিলের কাছে। শ্রীকান্তর কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছিলেন। মুশকিল হল, সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেট শুধু উৎসাহ দিলেই চলে না। ভাল 'টিপ্স' দিতে

গেলে নিজেকেও কলাকৌশলের দিক থেকে খুব শক্ত-পোক্ত হতে হবে। বোঝাতে হবে, কীভাবে দ্রুত খুঁজে নিতে হয় ব্যাটসম্যানের দুর্বলতা। এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরামর্শ দেওয়া শ্রীকান্তের ক্ষমতার বাইরে। বাকি ছিলেন বোরদে। নিজে বোলার ছিলেন, বোলারের মনস্তত্ত্ব বোঝেন বলেই নয় বোরদের ক্রিকেট-বুদ্ধিও প্রচণ্ড। কিন্তু পাকিস্তান সফরে তাঁর কাছ থেকেও রাজদান পেলেন দুয়োরানির ছেলের মতো ব্যবহার। কারণ? কারণ, আঙ্কোলা বোরদের শহরের লোক এবং ভারতীয় ম্যানেজার আগাগোড়া তাঁর প্রতি বেশি যত্নবান ছিলেন।

> **মিয়াঁদাদ বা ইমরানকে বল করার সময়ও কখনও ওঁকে হীনম্মন্যতায় ভুগতে দেখিনি। রাজদানের 'অ্যাকশন' ভাল। আউটসুইং ভাল আছে, জোর বোধহয় এ মুহূর্তে ভারতে সবার চেয়ে বেশি। কিন্তু শুধু বোলিং নয়, ওঁর মনোভাবের জন্যও রাজদান কার্যকর হবেন।**

এত সমস্যার কথা বিচার করলে প্রথম সফরে কিন্তু খারাপ ফল করেননি রাজদান। দিল্লির ফরসা, কোঁকড়া চুলঅলা এই তরুণের মধ্যে বেশ একটা আত্মবিশ্বাসের ছাপ আছে, যেটা সময় সময় 'পাকামি' মনে হলেও ফাস্ট বোলারের প্রয়োজনের দিক থেকে কিন্তু দারুণ উপযুক্ত। মিয়াঁদাদ বা ইমরানকে বল করার সময়ও কখনও ওঁকে হীনম্মন্যতায় ভুগতে দেখিনি। রাজদানের 'অ্যাকশন' ভাল। আউটসুইং ভাল আছে, জোর বোধহয় এ-মুহূর্তে ভারতে সকলের চেয়ে বেশি। কিন্তু শুধু বোলিং নয়, ওঁর মনোভাবের জন্যও রাজদান কার্যকর হবেন। সব সময় লড়াকু ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। ব্যাটসম্যান খুব পোড়-খাওয়া না হলে তাকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে কিছুটা চাপে রাখতে এই কৌশল খুব কার্যকর।

এই লেখা যখন তৈরি করছি, নিউজিল্যাণ্ড-ভারত প্রথম টেস্ট সবে শেষ হয়েছে। রাজদান টেস্টে সুযোগ পাননি। আশা করি পাবেন। আসল কথাটা হল, রাজদানকে এ-সফরে ভাল বল করতেই হবে। ভারতীয় দলে জায়গা রাখার জন্যই শুধু নয়, আগামী মরসুমে কোন্ রাজ্যে তিনি খেলবেন তাও নিউজিল্যাণ্ডে তাঁর পারফরম্যান্সের ওপর অনেকটা নির্ভর করছে। এ-বছর উত্তরাঞ্চলের হয়ে রাজদান খেলেছেন। দলে কপিল-মনোজরা ছিলেন না। উত্তরাঞ্চলের পুরো দল খেললে রাজদানের সেখানে জায়গা নেই-ই, দিল্লি দলেই বা কোথায়? মদনলাল, প্রভাকর, সঞ্জীব শর্মাকে বাদ দিয়ে দিল্লি নির্বাচকরা রাজদানকে খেলাবেন এমন সম্ভাবনা দেখছি না। তামিলনাড়ুও জানিয়ে দিয়েছে তারা উৎসাহী নয়। আসলে সব রাজ্যই 'রেডিমেড পণ্য' চায়। নতুন কাউকে নামিয়ে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবৃত্তি তাদের নেই। বোম্বাই বা বাংলার মতো দুর্বল বোলিং যাদের, এমন দলে হয়তো জায়গা পাবেন। কিন্তু লড়াই তাতেও কিছু কমবে না।

অতুল ওয়াসন আর আঙ্কোলার কথা ছেড়েই দিলাম, ভারতীয় যুব দলে এ-মুহূর্তে দুজন বোলার আছেন যাঁরা প্রতিভার বিচারে রাজদানের চেয়ে বিশেষ পিছিয়ে নেই। সমীর মেহরা এবং আশিস উইনস্টন জাইদি দুজনেই দু-দিন পরে ওঁর ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলবেন। এর মধ্যে সমীর সামান্য এগিয়ে। রাজদানের কাছাকাছি গতি ওঁর, হয়তো বা সামান্য কম। হাতে একইরকম ছোট আউট সুইং এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব। বল করার সময় হীনম্মন্যতায় ভোগেন না। অবশ্য ভুগবেনই বা কেন? রাজদানের মতো সেই একই পাঠশালায় যে ওঁর শিক্ষা। লিলির কাছে।

রাজদানকে নিয়ে শুধু একটাই ভয়। দিল্লির সেন্ট কলম্বাস স্কুলের প্রাক্তন এই ছাত্র এখনও যথেষ্ট পরিণত নন। সাফল্যকে কীভাবে গ্রহণ করা উচিত সে-সম্পর্কে কোনও রকম ধারণা ওঁর নেই। দর্শকদের হাততালি পেয়ে রাজদান নিজেকে হারিয়ে না ফেলেন।

চেতনকে কি ডাকা হবে

এই সম্ভাবনা কি সত্যিই আছে? আলোচনা করেছেন **অনুপ সেনগুপ্ত**

চেতন শর্মা

পাকিস্তানের বিখ্যাত বোলার সরফরাজ নওয়াজই কথাটা বলেছিলেন এক সাংবাদিককে। "আপনারা চেতন শর্মাকে নিয়ে এলেন না কেন? আমাদের পিচে বল ভাল মুভ করাতে পারত চেতনের মতো মিডিয়াম পেসার। এই উইকেটই ওর আদর্শ।" কথাটা ভেবেছিলেন শ্রীকান্তও। এবারের পাক-সফরের প্রথম দিকে ভারতীয় পেস বোলাররা যখন কোনও সাফল্যই পাচ্ছেন না, কপিলদেবের পাশে দাঁড়ানোর মতো একজনও নেই, তখন বাধ্য হয়ে শ্রীকান্ত ভারতীয় নির্বাচকদের কাছে চেতনকে পাঠানোর অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধ রাখা হয়নি। কারণ কী? খুব সম্ভবত চেতনের ধারাবাহিকতার অভাব দেখেই নির্বাচকরা তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারেননি। অথচ চেতন শর্মা সুযোগ যে পাননি, তা নয়। হঠাৎ-হঠাৎ একটা স্পেলে দুর্দান্ত বল করেও গেছেন। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মতো কঠিন প্রতিযোগিতায় পরপর তিন বলে তিনটি উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিক তার প্রমাণ। এটাকে স্বপ্নের বোলিং বলা যায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চেতন কপিলদেবের সহযোগী হয়ে উঠতে পারেননি। চব্বিশ বছরের চেতন এখন পর্যন্ত খেলেছেন ২৩টি, ২১৬৩ রান দিয়ে উইকেট পেয়েছেন ৬১টি। সেরা বোলিং ৫৮ রানে ৬ উইকেট। টেস্ট অভিষেক পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৮৪-৮৫ সিরিজে লাহোরে। কপিলদেবের প্রিয় বন্ধু হরিয়ানার চেতন শর্মা সেরকম কিছু করতে পারছেন না কেন? প্রথমত, তিনি হাঁটুর আঘাতে বিব্রত হয়েছেন, এ ছাড়া অনেকের মতো নিজের ওপর চেতনের আস্থা কম। নিউজিল্যান্ড সফরে বাদ গেলেন তিনি, আর কি সুযোগ পাবেন? বিশেষজ্ঞদের মত, সম্ভাবনা কম। মনোজ প্রভাকর দারুণ বল করছেন, এসেছেন অতুল ওয়াসন, এম. আর. এফ. ক্যাম্পের বিবেক রাজদান, রাজীব শেঠ ও আরও কয়েকজন প্রতিভাবান তরুণ পেসার। এঁরা ব্যর্থ হলে হয়তো আবার চেতনের কথা ভাবা হবে। সে দিন অনেক দূরে।

ময়দানের লড়াই

পূর্ব প্রকাশিতের পর

সতেরো বছর ধরে যা খেলেছি, তার জন্য আমি অনেকের কাছেই কৃতজ্ঞ। সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ কোচদের কাছে। তাঁরাই আমাকে তৈরি করেছেন, ভুলত্রুটি শুধরে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে আমি যে মাঠে লড়াই করে যেতে পেরেছি তাতে বাঘাদা, কোকোদা ও প্রদীপদার মতো কোচের অবদান কম নেই। এই সুযোগে যাঁর কাছে আমি সামান্যতম শিক্ষাও পেয়েছি, তাঁকেও আমার শ্রদ্ধা জানাতে চাই। গুরুঋণ শোধ করা যায় না, কিন্তু উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধা কোথায়?

> বাহাত্তর সালে আমার মতো নতুন খেলোয়াড়কে তিনি যেভাবে খেলানোর ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। শুধু আমাকে কেন, ৮ সত্তর দশকের অধিকাংশ খেলোয়াড়কেই প্রদীপদা তৈরি করেছিলেন। মোহন, পিণ্টু, সুভাষ, প্রসূন, হাবিব, বিদেশ, সুধীর—কে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ নয়? এরা প্রত্যেকেই ভাল, কিন্তু ঝকঝকে করে তুলেছিলেন পি. কে.।

খেলার একেবারে শুরুর দিকে, আগেই লিখেছি, আমাকে হাতে ধরে খেলা শিখিয়েছিলেন বরানগর স্পোর্টিং ক্লাবের নারানদা, নারায়ণ মণ্ডল। এর পর একে একে বিভিন্ন সময়ে পেয়েছি বাঘা সোম, সুশীল ভট্টাচার্য, প্রদীপ ব্যানার্জি, অচ্যুত ব্যানার্জি, অমল দত্ত, নিখিল নন্দী, অরুণ ঘোষ, বাসা, কিট্টু, শঙ্কর ব্যানার্জির কোচিং। এঁদের প্রত্যেকের কোচিং এক-এক রকম। এঁদের মধ্যে সেরা কে? এভাবে উত্তর দেওয়াটা বোধহয় সম্ভব নয়। বরং আমি আমার প্রিয় কোচের নাম জানাতে পারি। সেটাই ঠিক হবে।

বাঘাদাকে আমি এঁদের মধ্যে ধরছি না, কারণ সে-অর্থে বাঘাদা কোনওদিনই কোচিং করাননি। তবে তাঁর উপদেশ পেয়েছি সর্বদা, পেয়েছি স্নেহও। প্রয়োজনে নিজে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে বল বাড়াতে হয়, ট্যাকল করতে হয়, জায়গা নিতে হয়। বাঘাদার এইসব ব্যাপার ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারব না তাঁর স্নেহের কথা। একেবারে ছেলের মতো দেখতেন আমাদের। বাঘাদাকে যদি আর কিছুদিন পেতাম!

অচ্যুত ব্যানার্জি, অর্থাৎ কোকোদার মধ্যে এই স্নেহ পেয়েছি। ঠিক খেলোয়াড়-কোচ সম্বন্ধ ছিল না আমাদের। কোকোদার একটা ব্যাপার দারুণ ভাল লাগত। খারাপ খেললেও তিনি একটুও বকাঝকা করতেন না। বরং পরে বুঝিয়ে বলতেন। এতে কাজ হত অনেক বেশি।

সুশীল ভট্টাচার্যকে জুনিয়ার দলের কোচ হিসেবে পেয়েছি। জুনিয়ারদের তৈরি করার ব্যাপারে সুশীলদা ছিলেন একেবারে আদর্শ। নিখিলদার ছিল লড়াই করার তীব্র মানসিকতা। বাসাদার থিওরিটিক্যাল জ্ঞান ছিল দারুণ। শ্যাডো প্র্যাকটিস করাতেন আমাদের মনে আছে, যেন একেবারে বই থেকে তুলে আনা। তবে বাসাদা সম্বন্ধে তেমন কিছু বলতে পারব না। কারণ খুব অল্প সময়ই তাঁকে পেয়েছি।

অরুণদা নিপাট ভদ্রলোক, অমায়িক। কিছুদিন তাঁর অধীনে থেকেছি। প্র্যাকটিক্যাল বোধ অরুণদার খুব ভালই আছে। কিন্তু ভীষণ সেন্টিমেন্টাল এবং সিরিয়াস। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের খেলোয়াড় নিয়ে চলতে মাঝে-মাঝেই অসুবিধায় পড়েছেন অরুণদা। প্রয়োজনে কোচকে কড়া হতে হয়। কিন্তু অরুণদা এত ভদ্র যে, তা কোনওদিনই পারেননি। যেমন, আমি একজন খেলোয়াড়কে জানি যে প্রায়ই প্র্যাকটিসে এসে আজ পায়ে ব্যথা, কাল শরীর খারাপ, পরশু জ্বর এ-সব বলে অরুণদার কাছ থেকে ছুটি নিত। অরুণদা এত ভদ্র, সব বুঝেও কিছু বলতেন না। এতে অবশ্য আসল ক্ষতি হয়েছিল সেই খেলোয়াড়টিরই।

অমল দত্ত-র কোচিং আমি সেরকম পাইনি। অমলদার জ্ঞান অনেক, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কেন জানি না, তাঁর কোচিংয়ে অল্প সময়েও নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারিনি।

শঙ্কর ব্যানার্জি কিন্তু বেশ সফল কোচ। ওর কোচিং-এ মোহনবাগান সাফল্যও পেয়েছে। শঙ্কর আমাদের সঙ্গে খেলেছে, হাঁটুতে লাগার পর বাধ্য হয়ে খেলা ছেড়ে দিয়ে পরে কোচিং-এ আসে। আমাদের সঙ্গে কোচ হিসেবে নয়, মিশত বন্ধুর মতোই। কিন্তু যাকে দিয়ে যা করিয়ে নেওয়ার তা করাতই। সে-ব্যাপারে কোনও সমঝোতা করেনি। অত্যন্ত ভদ্র ছেলে, তাই বোধহয় ময়দানে টিকতে পারল না।

এতক্ষণ যাঁর কথা বলিনি, তিনিই আমার প্রিয় কোচ। হ্যাঁ, আমি পি কে ব্যানার্জির কথা বলছি। কোচ হিসেবে প্রদীপদার সব গুণ, তাঁর কোনও দোষ আমি দেখিনি, এটা বলব না। কিন্তু সব মিলিয়ে তিনি আমার ওপর যা প্রভাব বিস্তার করেছেন, আর কেউই তা পারেননি।

প্রদীপদাকে আমি আমার বড় ক্লাবের প্রথম দিন থেকেই পেয়েছি, তাই হয়তো তাঁর প্রতি আমার একটা আলাদা শ্রদ্ধা আছে। এবং এটাও বলতে হবে, বাহাত্তর সালে আমার মতো নতুন খেলোয়াড়কে তিনি যেভাবে খেলানোর ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তা তাঁর

গৌতম সরকার

পক্ষেই সম্ভব ছিল। শুধু আমাকে কেন, সত্তর দশকের অধিকাংশ খেলোয়াড়কেই প্রদীপদা তৈরি করেছিলেন। মোহন, পিণ্টু, সুভাষ, প্রসূন, হাবিব, বিদেশ, সুধীর, সুরজিৎ—কে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ নয়? এরা প্রত্যেকেই ভাল খেলোয়াড়, কিন্তু প্রত্যেককেই ঝকঝকে করে তুলেছিলেন প্রদীপদা।

প্রদীপদাকে আমি পেয়েছি মোট সাত বছর, ইস্টবেঙ্গলে চার এবং মোহনবাগানে তিন। বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর—ইস্টবেঙ্গলের স্বর্ণযুগ। এবং এই সময় খেলোয়াড়দের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি অবদান পি কে-র। বাহাত্তরে আমার যেমন প্রথম বড় দলে আসা, প্রদীপদারও তাই। এর আগে ১৯৬৮-তে খেলা ছাড়ার পরই প্রদীপদা বাটা দলকে কোচিং দেন এবং বাটা রীতিমত চমক জাগায় কলকাতা মাঠে। তারপরই তিনি ফিফা কোচিং নিতে চলে যান টোকিওতে। ফিরে আসার পর প্রথম বড় ক্লাবের দায়িত্ব নিলেন,

প্রদীপদার সঙ্গে বিদেশ, সুব্রত ও আমি

ইস্টবেঙ্গলের কোচ হলেন।

প্রথম বছরেই কী দুর্দান্ত সাফল্য! অথচ সে-বছরই দল ছেড়ে গিয়েছিল বেশ নামী কয়েকজন তারকা—কাজল মুখার্জি, পরিমল দে, কালন গুহ, সীতেশ দাস, জন, পিটার থঙ্গরাজ। প্রদীপদা দমলেন না। পিণ্টু, অশোকলাল, সুধীর, হাবিব, আকবর, মোহন, প্রসাদ, আমি—এই নিয়ে লড়াই শুরু হল। সুধীর, প্রসাদ তখন স্টার হলেও আমরা কিছুই না। প্রথম বড় ম্যাচ, মহমেডানের বিরুদ্ধে নামিয়ে দিলেন আমাকে। নামার আগে এমন তাতালেন প্রদীপদা আমায়, যে মনে হচ্ছিল, প্রাণ গেলেও ম্যাচ ছাড়ব না। মনে আছে বলেছিলেন, "লক্ষ জনতার সামনে তোমায় সুযোগ দিচ্ছি, এত জুনিয়ারকে কেউ সুযোগ দেয় না। এত লোকের থুতু যেন আমায় না খেতে হয়।" শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি গোল করেছিলাম। প্রদীপদা খেলার শেষে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

বাহাত্তরে ইস্টবেঙ্গল দুর্দান্ত সব রেকর্ড করল। শিল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স জিতে ত্রিমুকুট পেল, ছ'টি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে ছ'টিতেই জয়ী—লিগ, শিল্ড, রোভার্স, ডুরান্ড, বরদলুই আর ডি সি এম ঘরে তুলল এবং ১৯০১ সালের পর, একাত্তর বছর বাদে, একটাও গোল না খেয়ে লিগ চ্যাম্পিয়ান হল। প্রদীপদার কোচিং-জীবনের সোনার দিন শুরু হল।

তারপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ইস্টবেঙ্গল থেকে মোহনবাগানে এলেন—ট্রোফি যেন তাঁর পিছু পিছু এল। কিন্তু শুধু সাফল্য দিয়েই কি প্রদীপদাকে বিচার করা উচিত? আমার মনে হয়, না। প্রদীপদার সময়েও ক্লাব হেরেছে। কিন্তু কখনও তাঁকে ভেঙে পড়তে দেখিনি। নতুন উদ্যমে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন।

অনেকে বলেন (তাঁরা অবশ্য নিন্দা করতে চান), প্রদীপদার সত্তরের সাফল্যের কারণ, দলে অনেক তারকা ছিলেন। কথাটা আংশিক সত্য। আমাদের সময়ে অধিকাংশ খেলোয়াড় প্রতিভাবান সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের ত্রুটিও ছিল অনেক। সুধীর, পিণ্টু প্র্যাকটিসে খুব একটা মনোযোগী ছিল না, বড়ে মিঞা হাবিব ছিল প্রচণ্ড 'মুডি'। যার সঙ্গে যেরকম, সেরকম ব্যবহার করে প্রদীপদা তার কাছ থেকে সেরা খেলা বের করে আনতে পারতেন। কোচ হিসেবে এটাই তো তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব।

খেলোয়াড়দের মনস্তত্ত্ব, অর্থাৎ প্রত্যেকের মানসিক ভাবনাচিন্তা নিয়ে এতখানি বিশ্লেষণ করতে আর কোনও কোচকে দেখিনি। কে কেন খেলতে পারছে না, কোথায় তার অসুবিধে, এ-বিষয়ে তিনি সজাগ থাকতেন। হয়তো দেখা গেল তার শরীরও খারাপ নয়, পায়েও আঘাত নেই, কোনও এক নিকট আত্মীয় অসুস্থ। তাই সে মন দিয়ে খেলতে পারছে না। প্রদীপদা ঠিক কারণ খুঁজে বের করতেন। সমস্যার সমাধান করতেন। খেলোয়াড়টি খেলা ফিরে পেত।

এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ সুভাষ ভৌমিক। শুনেছি, ১৯৭৩ সালে মোহনবাগান ওকে বাদ দিয়েছিল অপয়া বলে। সেই মনমরা সুভাষকে দিনের পর দিন কী পরিশ্রমে ও যত্নে যে প্রদীপদা তৈরি করে তুলেছিলেন তা নিজের চোখে দেখেছি। পরবর্তীকালে স্ট্রাইকার এবং উইঙ্গার দু'জায়গাতেই সুভাষ কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

প্রদীপদার টিম মিটিং ছিল শোনার মতো। এমনভাবে ছক সাজাতেন এবং আমাদের বোঝাতেন যে তা মানতে অসুবিধে হত না। আর প্রদীপদার বিখ্যাত 'ভোকাল টনিক' তো আছেই। খেলতে নামতাম যখন, তখন গা দিয়ে আগুন ঝরত। একই উত্তেজনা প্রদীপদার চোখে-মুখেও।

যখন সিনিয়ার হয়েছি, প্রদীপদার অনেক কথা হয়তো মানতে পারিনি। খেলোয়াড় পরিবর্তন, দলের 'স্ট্র্যাটেজি' নিয়ে প্রতিবাদ করেছি। কখনও মেনেছেন, কখনও মানেননি।

রাগ করেছি। তবু শ্রদ্ধার আসন থেকে তাঁকে নামাতে পারিনি। ভৌমিকের মতো আমাকেও তো তিনি অতি যত্নে তৈরি করেছিলেন। গুরুর ঋণ অস্বীকার করার মতো 'বড়' খেলোয়াড় আমি কখনওই হতে পারিনি। (ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও
সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের
অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

খেলাধুলো

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতি আক্রমণের একটি কৌশল

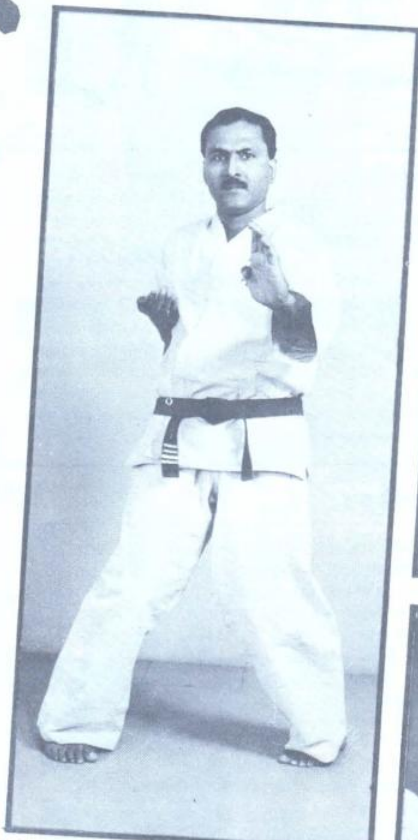

ক্যারাটেতে 'সুতো'র এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার পর প্রতিআক্রমণের সময় দরকার মতো অবস্থা অনুযায়ী যখন ঘুসি মারার দরকার তখন ঘুসি মারতে হবে, আবার যখন দরকার তখন সুতো বা চপের ব্যবহার করতে হবে। এইবার আমি যে সুতো বা চপ্ করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব, তার জাপানি নাম হল 'সুতো সাকুতসো উচি কোমি'।

সুতো সাকুতসো উচি কোমি : এই কথাটির অর্থ কলার বোন্ লক্ষ করে চপ্ করা। এই কৌশলটি অনুশীলন করার সময় সোজা সামনের দিকে কলার বোন্ লক্ষ করে আঘাত হানার চেষ্টা করা উচিত। আগেই বলেছি যে, কিওকুশিন ক্যারাটেতে হাতের সাহায্য মারার বা মার আটকানোর পদ্ধতিগুলি সাধারণত সানচিনদাচি থেকে অনুশীলন করা হয়। এইবার যে সুতোর অনুশীলনের কথা বলছি, সেটাও সানচিনদাচি থেকে করতে হবে। প্রথমে ইওইদাচিতে তারপর হাত ও পায়ের অবস্থার পরিবর্তন করে ঠিকভাবে সানচিনদাচিতে দাঁড়াতে হবে। এইবার সানচিনদাচি থেকে হাতের অবস্থার পরিবর্তন করে বা হাতটাকে সামনের দিকে নিজের কলার বোনের উচ্চতায় কনুই থেকে একটু মুড়ে আঙুলগুলোকে ঠিকভাবে শক্ত করে পাশাপাশি রাখতে হবে। এর পর কবজি থেকে হাতের অংশ মুড়ে হাতের আঙুলগুলো মাটির সঙ্গে উলম্বভাবে (বুড়ো আঙুলটা ভিতর দিকে) রেখে হাতের প্রান্তভাগ বাইরের দিকে রেখে কোমর থেকে শরীরের ওপরভাগ ডান দিকে ৪৫° ডিগ্রি ঘুরিয়ে দাঁড়াতে হবে, সেই সঙ্গে ডান হাতটা ডান পাঁজর স্পর্শ করে রাখতে হবে। ঠিকভাবে দাঁড়ানো হলে তারপর ডান হাত দিয়ে শুরু করতে হবে। ডান হাতে শুরু করার আগে ডান হাতের চেটো ওপর দিকে ছিল, এইবার ডান হাতটাকে সামনে প্রতিপক্ষের (কাল্পনিক) দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে হবে, ছোঁড়ার শুরুতে ডান হাতের চেটো ওপর দিকে ছিল, যেই ছোঁড়া শুরু হল, ডান হাতের চেটো অমনি ভেতর দিকে ঘুরিয়ে এনে আঙুলের মাথা সামনের দিকে রেখে (অনেকটা ছুরির ফলার মতো মাথার অংশ দিয়ে সামনে যেভাবে আঘাত করা যায় সেইভাবে) সোজা সামনের দিকে হাতটাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ঠিক প্রতিপক্ষের কলার বোন স্পর্শ করার আগে মোচড় দিয়ে হাতের চেটো ও আঙুলের অংশ কবজি থেকে ঘুরে বাইরের প্রান্ত ভাগ দিয়ে আঘাত করতে হবে, সেই সঙ্গে বাঁ হাতটাকে সোজা পেছনে এনে ডান হাতের মতো বা পাঁজরার সঙ্গে স্পর্শ করে রাখতে হবে। যখন ডান হাতে অনুশীলন করতে হবে, তখন কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ বাঁ দিকে ৪৫° ডিগ্রি ঘুরে যাবে। এইবার আবার বাঁ হাত দিয়ে, তারপর ডান হাত দিয়ে অনুশীলন করতে হবে। প্রতি হাতে কুড়িবার করে করতে হবে। প্রথমে প্রতিটি ক্যারাটের কৌশলই আস্তে-আস্তে রপ্ত করে নিয়ে তারপর স্পিড বাড়ানো উচিত। বাঁ হাত দিয়ে মারার সময় কোমর থেকে শরীরের ওপর ভাগ ডান দিকে ৪৫° ডিগ্রি ঘুরবে।

ফোটো : উৎপল সরকার

বিশ্বের প্রথমবার

'পরবর্তী ভিভ রিচার্ডস' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে রিচি রিচার্ডসনকে। ব্যাটে যেমন প্রবল শক্তি, খেলার ভঙ্গিটিও তেমনই আকর্ষক। ভারতের বিরুদ্ধে গত সিরিজে দারুণ খেলেছেনও ওয়েস্ট ইন্ডিজের রিচার্ডসন। সদ্য এক কম্পিউটার সমীক্ষায় গত বছরের বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানের সম্মান পেলেন তিনি। তাঁর পয়েন্ট ৮৯১। গত বছরের প্রথম জাভেদ মিয়াঁদাদ এবারে দ্বিতীয়, পয়েন্ট ৮৬৮। তৃতীয় এবং চতুর্থ যথাক্রমে মার্ক গ্রেটব্যাচ (নিউজিল্যাণ্ড, পয়েন্ট ৮৬৫) ও ভিভ রিচার্ডস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ৭৫৮)। দুজন ভারতীয় এই তালিকায় আছেন। তরুণ ব্যাটসম্যান সঞ্জয় মঞ্জরেকর হয়েছেন পঞ্চম (পয়েন্ট ৭৫৪) এবং দিলীপ বেঙ্গসরকর নবম (পয়েন্ট ৭৩০)।

বোলারদের মধ্যে প্রথম নিউজিল্যাণ্ডের রিচার্ড হ্যাডলি। পরেই আছেন যথাক্রমে ম্যালকম মার্শাল, ইমরান খান এবং কপিলদেব। অর্থাৎ ব্যাটে-বলে প্রথম দশজনের মধ্যে তিনজনই ভারতীয়।

চল্লিশ বছরেও

ছবিটি যাঁর, তাঁর বয়স ৪০। এই বয়সে আমাদের দেশে খেলোয়াড়দের খেলা ছেড়ে বিশেষজ্ঞের ভূমিকাতেই সাধারণত দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডের এই মানুষটি কিন্তু এখনও খেলছেন এবং আগামী বিশ্বকাপ ফুটবলেও ইংল্যান্ড দলের গোলরক্ষার দায়িত্বে থাকবেন। নিজের শেষ বিশ্বকাপে নিশ্চয়ই স্মরণীয় ফুটবলই খেলবেন পিটার শিলটন।

লেণ্ডলের সময়

টেনিস তারকা ইভান লেণ্ডলের আয় কত ? বছরের শেষে একটা হিসেব দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নয়। কারণ সেখানে পুরস্কার-অর্থের অঙ্কই থাকে, বিজ্ঞাপন থেকে আয় এবং বিভিন্ন সংস্থায় লগ্নি করা বিপুল অর্থের পরিমাণ থাকে না। পরিমাণটা কয়েকশো কোটি টাকার কম হবে না। তবে এই সঙ্গে আর একটা কথাও জেনে রাখা দরকার। এর জন্য লেণ্ডলকে এখনও কী কী করতে হয় ? রাতে তিনি ঘুমোন মাত্র দু ঘণ্টা। কমপক্ষে সাত ঘণ্টা অনুশীলন। এ ছাড়া, শারীরচর্চা তো আছেই, এবং দিনের পর দিন ক্লান্তিকর টুর্নামেন্ট খেলে যাওয়া। লেণ্ডল বলেছেন, "অবসর শব্দটা আমি জানি না।" সময় বাঁচাতে লেণ্ডলকে হেলিকপ্টারও ব্যবহার করতে হয়। কোটিপতি এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় হতে গেলে কী করতে হয়,তা নিশ্চয় এবার বোঝা গেছে !

একটি স্বপ্ন

শখ ছিল ক্রিকেটার হবেন, টেস্ট খেলবেন। খেললেনও, তবে সেরকম নয় যে টেস্টে সুযোগ পাবেন। কিন্তু ক্রিকেট মাঠ তো তাঁর প্রাণ। সুতরাং এমন কিছু করতে হবে, যাতে টেস্ট-ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকা যায়। শুরু করলেন আম্পায়ারিং। আস্তে-আস্তে নাম ছড়াতে লাগল। তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তই নিখুঁত। প্রতিবাদ করার সাহস পেলেন না বিতর্কিত খেলোয়াড়রাও। সাহসী ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষটি এখন সব দেশের ক্রিকেটারদেরই শ্রদ্ধার পাত্র। কারণটা কী ? তিনি জানিয়েছেন, "একশো ভাগ নিশ্চিন্ত না হয়ে আমি কোনও সিদ্ধান্ত নিই না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় খেলোয়াড়, দল, দর্শক কারও কথাই মাথায় রাখি না।" এর ফলে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস কারও নেই। আটান্ন বছর বয়সেও শরীর দারুণ সুস্থ রেখেছেন, একেবারে ক্রিকেটারদের মতোই। একটি স্বপ্নই শুধু পূরণ হয়নি—মৃত্যু যখন আসবে, তখন যেন মাঠেই থাকেন। এই ভদ্রলোক হলেন—হ্যারল্ড ডেনিস বার্ড। সকলের কাছে তিনি অবশ্য ডিকি বার্ড নামেই পরিচিত।

অন্য ব্যবস্থা

ফুটবল মাঠে মারামারিটা এখন আর নতুন কোনও ঘটনা নয়, রেফারিরাও জড়িয়ে পড়ছেন গোলমালে। মাঠে শান্তি ফিরিয়ে আনতে তাই ব্রিটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এখন অন্য এক ব্যবস্থা নিতে চাইছেন। প্রথম ডিভিশনের প্রাক্তন ক্লাব ফুটবলারদের কাছে আবেদন করছেন, তাঁরা যেন রেফারিং-এ আসেন। তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এখনকার খেলোয়াড়দের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন।

দার্শনিক ম্যাক

"এখনও আমি যে কোনও দিন যে কোনও খেলোয়াড়কে হারাতে পারি। কিন্তু সেই লড়াই করার শক্তিটা ক্রমশ যেন হারিয়ে ফেলছি।" প্রথম বাক্যটা শুনলে বোঝা যায় কথাটা জন ম্যাকেনরো বলছেন। কিন্তু দ্বিতীয়টাও কী তিনি বলতে পারেন ? টেনিসের মেজাজি যুবক তা হলে এখন অনেক শান্ত হয়েছেন। শুধু শান্ত নয়, দার্শনিক কথাবার্তাও বলছেন তিনি। "টেনিসের লড়াই দেখে অনেকে অবাক হন। কিন্তু বাইরের বিশ্বে যা চলছে, টেনিসের লড়াই তার কাছে কিছুই নয়।" ম্যাকেনরো বলেছেন।

মধুমিতা

রেকর্ড ভাঙার আগেই খবর করাটা কি ঠিক ? কিন্তু সাত-সাতবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হওয়াটাও নিশ্চয় কম কৃতিত্বের নয়। মধুমিতা সিং বিষ্ট সাতবার ব্যাডমিন্টনে জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হয়ে আমি ঘিয়ার রেকর্ড স্পর্শ করলেন। ১৯৮২ সালে শুরু, তারপর ১৯৮৪ থেকে টানা সিনিয়ার বিভাগে বিজয়িনী।

ফোটো : 'স্পোর্টস্টার' পত্রিকার সৌজন্যে

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কত সহজেই না ছবি আঁকে কম্পিউটার
ফোটো : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর সৌজন্যে

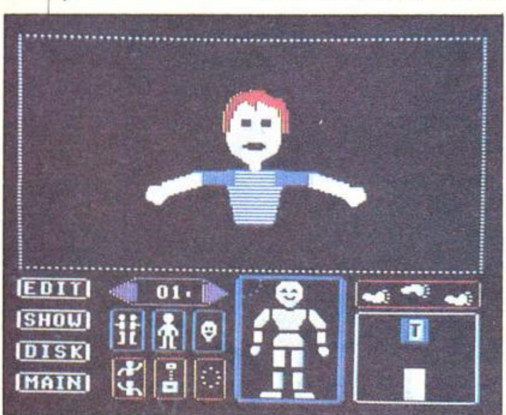

স্কুলের কম্পিউটার

কম্পিউটারকে নিজের কাজের সঙ্গী করে নিতে হলে কীভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, লিখেছেন **পবিত্রকুমার চক্রবর্তী**

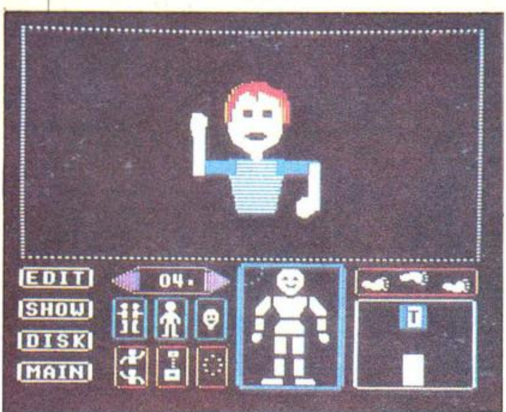

পূর্ব প্রকাশিতের পর

এবার disk ব্যবহার ও format করার কথা বলি। কম্পিউটারের সঙ্গে video monitor ও keyboard ছাড়াও একটা চ্যাপটা বাক্স দেখতে পাবে। এটাও কম্পিউটারের সঙ্গে flat cable দিয়ে সংযুক্ত থাকে। একে বলা হয় disk drive। এর সামনে আড়াআড়িভাবে একটি ছিদ্র বা slit-এর মধ্যে floppy disk ঢুকে যায়। ঢোকানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে, disk-এর খামের যেদিকে ভাঁজের চিহ্ন থাকে, সে-দিক নীচে থাকবে, এবং disk-এর এক ধারে গর্ত কাটা থাকে, সেটা থাকবে সামনে বাঁ দিকে। Disk slit-এর মধ্যে ঢুকিয়ে drive-এর সামনে যে latch আছে, সেটা ডান দিকে যতদূর যায় ঘুরিয়ে lock করে দিতে হবে। একটা কথা সবসময় মনে রাখবে। disk drive-এর সামনে একটা লাল আলো আছে। ওই আলো যতক্ষণ জ্বলবে,

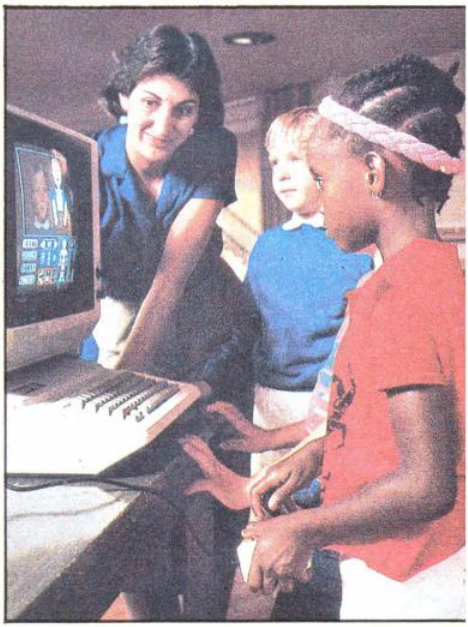

ততক্ষণ disk ঢোকানো বা বের করা চলবে না।

তোমাদের প্রতি স্কুলেই কিছু-কিছু Program লেখা disk দেওয়া হয়েছে। প্রতি disk-এ একটি label-এ Program-এর নাম লেখা আছে। এর মধ্যে একটি আছে system utility disk। ওই diskটি নিয়ে disk drive-এ ঢুকিয়ে lock করে দাও। এবার টাইপ করো :

> ⋆ CAT [RETURN]

দেখবে disk drive-এর আলো জ্বলে উঠে কিছুক্ষণ পরে নিভে যাবে, এবং disk-এ যা-যা program আছে screen-এ সেগুলির নাম ফুটে উঠেছে। দেখে নাও এর মধ্যে ⋆ FORM 40 আছে কি না। যদি থাকে, তা হলে আবার টাইপ করো :

> ★ FORM 40 [RETURN]

আবার disk drive-এর আলো কিছুক্ষণ জ্বলে নিভে যাবে, এবং screen-এ ফুটে উঠবে :

DO YOU REALLY WISH TO FORMAT THE DISKETTE (Y/N)?

এর কারণ হল, একেবারে নতুন disk-ই সাধারণত format করা হয়ে থাকে। যদি program লেখা কোনও disk আবার format করো, তা হলে format করা যাবে

তোমাদের স্কুলে নিশ্চয় program লেখা বহু educational disk দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে এবার বলছি। ওই ধরনের কোনও একটি disk drive-এ ঢুকিয়ে lock করে দাও। এবার shift চাবিটি টিপে ধরে থেকে break চাবিটি টিপে ছেড়ে দাও। ওই program এখন run করবে। screen-এ যা যা নির্দেশ আসবে, হুবহু সেইভাবে টাইপ করলে (RETURN চাবি টিপতে যেন ভুল না হয় !) programটির বিষয়বস্তু দেখতে পাবে।

ঠিকই, কিন্তু সেই disk-এ যা-যা program আছে সব মুছে যাবে। সেই কথা তোমাদের মনে করিয়ে দেবার জন্যই কম্পিউটারের এই সতর্কবাণী। সুতরাং নিশ্চিত হয়ে নাও যে disk format করতে যাচ্ছ সেটি সত্যিই নতুন। এবার ? চিহ্নের পাশে যেখানে cursor আছে সেখানে টাইপ করো :

Y [RETURN]

তখন screen-এ ফুটে উঠবে :

INSERT THE TARGET DISKETTE IN DRIVE A

STRIKE ANY KEY WHEN READY

এবার disk drive থেকে utility disk বের করে নিয়ে সেখানে নতুন diskটি ঢুকিয়ে lock করে দাও। সাবধান! এর মধ্যে যেন Keyboard-এ কোনওমতে হাত না লাগে। নতুন disk ঢোকানো হয়ে গেলে যে-কোনও একটি চাবি টিপে দাও। দেখবে disk drive-এর লাল আলো আবার জ্বলে উঠেছে, এবং screen- ফুটে উঠেছে :

FORMATTING

কিছুক্ষণ পরে ওই আলো নিভে যাবে, এবং screen-এ ফুটে উঠবে :

FORMAT COMPLETE
FORMAT ANOTHER (Y/N?)

এখানেও ? চিহ্নের পাশে cursor-এর জায়গায় টাইপ করো :

N [RETURN]

কম্পিউটার বিশেষে screen-এর massageগুলি সামান্য এদিক-ওদিক হতে পারে। এ-নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, শুধু নির্দেশগুলো যথাযথভাবে পালন করবে। যেমন যদি Y/N-এর পরিবর্তে YES/NO থাকে তা হলে YES বা NO টাইপ করতে হবে। যদি নির্দেশ থাকে 'STRIKE RETURN WHEN RETURN, RETURN চাবিটি টিপবে।

এখন তোমার নতুন disk প্রস্তুত। এতে Program write করা বা এর থেকে Program read করা চলবে। Drive-এ এই Diskটি ঢুকিয়ে - রাখা অবস্থায় তোমাদের Program লিখে একদম শেষে টাইপ করো :

> SAVE b "SAMPLE"
[RETURN]

Drive-এর আলো জ্বলে উঠে আবার নিভে যাবে। এর অর্থ তোমাদের লেখা Programটি SAMPLE নামে ওই disk-এ লেখা রইল। এখন যদি টাইপ করো :

> ★ CAT [RETURN]

দেখবে screen-এ ফুটে উঠেছে :

SAMPLE

এর পর যখনই এই Programটি ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে, disk drive-এ এই disk-টি ঢুকিয়ে lock করে টাইপ করবে :

> LOAD b "SAMPLE"
[RETURN]
> RUN [RETURN]

মনে রেখো, একটি disk-এ বহু Program, প্রত্যেকটি এক-এক নামে store করে রাখা যায়। কোনও Program-এর নাম হিসেবে সর্বোচ্চ দশটি অক্ষর ব্যবহার করা যাবে। তবে ★ বা ! চিহ্ন দিয়ে কোনও Program-এর নাম শুরু করা যাবে না। Program-এর নাম নিজেরাই সহজবোধ্যভাবে এমন করে ঠিক করে নেবে যা দেখে তোমরা মোটামুটি বুঝে নিতে পারো ওই Program-এর কাজ কী। একটা disk-এ কী কী Program রাখলে সেটা বোঝার জন্য একটা label-এর ওপর সেই Programগুলোর নাম লিখে ওই disk-এর খামের ওপর সেঁটে রাখা ভাল। disk-এর বাক্সের মধ্যেই এই label-এর stickerগুলি রাখা থাকে। তবে সাবধান। disk-এর খামে label সেঁটে তারপর, বিশেষত বলপেন দিয়ে, কখনও লিখবে না।

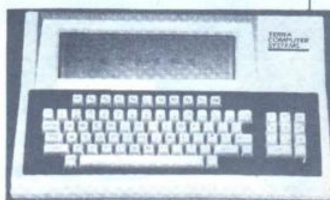

অনেক কম্পিউটার সহজেই বহনযোগ্য

তোমাদের স্কুলে Program লেখা বহু educational disk দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে এবার বলছি। ওই ধরনের কোনও একটি disk drive-এ ঢুকিয়ে lock করে দাও। এবার shift চাবিটি টিপে ধরে থেকে break চাবিটি টিপে ছেড়ে দাও, এবং তারপর shift চাবিটিও ছেড়ে দাও। program এখন run করবে। screen-এ যা-যা নির্দেশ আসবে, হুবহু সেইভাবে টাইপ করলে (RETURN চাবি টিপতে যেন ভুল না হয় !) programটির বিষয়বস্তু দেখতে পাবে। এ-বিষয়ে বিশদ বর্ণনা এই disk-এর সঙ্গে দেওয়া পুস্তিকাতেই পাবে। ওই disk-এর programগুলোর জায়গায় যাতে অন্য program করতে না পারে, তার ব্যবস্থাও রয়েছে। disk-এর বাক্সে দেখবে ছোট-ছোট অনেক sticker দেওয়া আছে। ওই sticker দিয়ে disk-এর পাশে যে কাটা গর্তটি আছে, ওই জায়গাটা বন্ধ করে দিলেই ওই disk-এ আর কোনও program write করা যাবে না—শুধুমাত্র

ওর থেকে program read করা চলবে। একে বলে disk কে write protect করা। সব educational diskগুলো এইভাবে write protect করে নেওয়া ভাল। আরও ভাল হবে যদি এই disk গুলোর সব program অন্য disk-এ copy করে নিয়ে সেই copy করা program ব্যবহার করো।

এর পরে cassette tape-এ program store করা এবং এর থেকে program load করার বিষয়ে আলোচনা করছি। cassette tape recorder ও কম্পিউটারের সঙ্গে cable দিয়ে যুক্ত থাকে। এতে program write করতে হলে প্রথমে recorder-এর switch কে "Remote" অবস্থানে রাখতে হবে। এরপরে disk drive-এ utility disk ঢুকিয়ে টাইপ করো:

> ★TAPE [RETURN]

তারপর টাইপ করো:

>SAVE ♭ "SAMPLE" RETURN

Screen-এ ফুটে উঠবে:

RECORD then RETURN

এবারে cassette-এর tape কে Rewind করে একদম শুরুতে নিয়ে এসো। ওই অবস্থায় recorder-এর counter কে "O" করে দাও। তারপর cassette-এর যে অংশ থেকে নতুন টেপ আরম্ভ (অর্থাৎ যেখানে ইতিমধ্যে কিছু record করা নেই) সেই অংশটি Fast Forward (FF) চাবির সাহায্যে Recording head-এর সামনে নিয়ে এসো। এবার আবার counter-এর reading লক্ষ করে নাও। তারপর

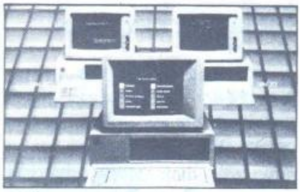

একইসঙ্গে recorder-এর "Record" এবং "Play" চাবিদুটি টিপে দিয়ে কম্পিউটারের RETURN চাবি টিপলে screen-এ দেখা যাবে:

SAVING...

SAVED..

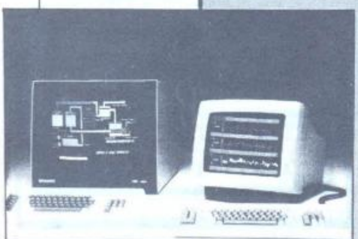

◇

যদি program লেখা কোন disk আবার format করো, তা হলে format করা যাবে ঠিকই, কিন্তু সেই disk-এ যা-যা program আছে সব মুছে যাবে। সেই কথা তোমাদের মনে করিয়ে দেবার জন্যই কম্পিউটারের এই সতর্কবাণী।

◇

SAVED হয়ে গেলে Recorder-এর 'Stop' চাবিটি টিপে দাও এবং counter-এর নতুন reading আবার লক্ষ করে নাও। অন্য Program save করতে হলে এই reading-এর পর থেকে save করা শুরু করতে হবে।

এখন যদি cassette থেকে আবার এই Program ব্যবহার করতে চাও, তা হলে rewind করে প্রথমে যেখান থেকে record শুরু করেছিলে, সেই counter reading-এ নিয়ে এসো। এবার কম্প্যুটারে টাইপ করো:

>LOAD b "SAMPLE"
RETURN

এবং তারপর recorder-এর "Play" চাবিটি টিপে দাও। Screen-এ ফুটে উঠবে:

SEARCHING...

LOADING...

STOP

এখন আবার recorder-এর "Stop" চাবি টিপে recorder বন্ধ করে Programটি কম্পিউটারে run করতে পারবে।

বাকি রইল Printer। এতে কীভাবে কাগজ পরাতে হয় তার বিবরণ এর পুস্তিকাতেই পাবে। যদি কম্পিউটার off করা অবস্থায় Printer-এর linefeed switch on করো, তা হলে দেখতে পাবে Printer-এ যা যা হরফ আছে সেগুলো কাগজে ছাপা হচ্ছে। এইভাবে বোঝা যায় Printer ঠিক আছে। এখন কম্পিউটার switch on করে Printer-এর on line switchটি টিপে দিলে দেখবে ওই switchটির ওপরে একটি লাল আলো জ্বলে উঠেছে, অর্থাৎ Printer এখন কম্পিউটারের নির্দেশমতো চলতে প্রস্তুত। এই অবস্থায় যদি কম্পিউটারের CTRL চাবিটি টিপে ধরে থেকে B টাইপ করে ছেড়ে দেওয়া যায়, তা হলে Screen-এ যা যা লেখা হবে Printer ও কাগজে তাই ছাপবে। এই Print করা বন্ধ করতে হলে কম্প্যুটারে আবার CTRL চাবি টিপে ধরে থেকে C টাইপ করে ছেড়ে দিতে হবে। On line switchটি আর একবার টিপলে এর আলো নিভে যাবে এবং কম্পিউটার থেকে Printer বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

Keyboard-এর বিশেষ কয়েকটি চাবির সম্বন্ধে দু এক কথা বলে শেষ করছি। Break চাবিটি টিপলে কম্পিউটারে যা যা Program আছে সব মুছে গিয়ে screen পরিষ্কার হয়ে যাবে—আবার নতুন করে Program লিখতে হবে। যদি কোনও Program run করতে করতে থামানোর প্রয়োজন হয়, তবে Escape চাবিটি টিপতে হবে। তবে এক্ষেত্রে Program কম্পিউটারে থেকে যাবে এবং আবার run করা যাবে।

যদি কোনও সময় দেখা যায় যে screen-এ লেখা কোনও দীর্ঘ তালিকা পড়তে পারার আগেই ওপরদিকে উঠে চলে যাচ্ছে, তা হলে CTRL ও Shift চাবিদুটি একসঙ্গে টিপলে তা থেমে যাবে। আবার যে-কোনও চাবি টিপলেই তা আবার উপরদিকে উঠতে থাকবে যতক্ষণ না তালিকা শেষ হচ্ছে।

এবার মোটামুটিভাবে তোমরা স্কুলের কম্পিউটার চালাতে পারবে। তবে, যা শিখলে তার চেয়েও অনেক বেশি অজানা রয়ে গেল। 'আনন্দমেলা'র পাতাতেই তোমরা ক্রমেই সে সব জানতে পারবে।

প্রথম খেলায় রোভার্সের অতর্কিত পরাজয়ের আংশিক কারণ স্ট্রাইকার কেনি লোগানের দক্ষতার অবনতি। কিন্তু মেলচেস্টার 'এ' টিমের খেলায় লোগান রোকফোর্ডের দুরন্ত তরুণ ফরোয়ার্ড অ্যান্ডি লককে ছাপিয়ে যাওয়ার পরে রয় রোকফোর্ডের ড্রেসিং-রুমের দিকে যাচ্ছে!
রোকফোর্ড ড্রেসিং রুম
রয়, ওখানে যাচ্ছ কেন? কোনি লোগান কি রোকফোর্ডের খেলোয়াড়দের সঙ্গে গল্প করতে গেছে?
তা তো জানি না, ব্ল্যাকি...
রোভার্সের রয়
কেনিকে এখনই প্রথম দলে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছি না। ওর আরও অনুশীলন দরকার। ওর সঙ্গে পরে কথা বলব...
...এই মুহূর্তে আমি ওই ছেলেটাকে নিয়ে ভাবছি!
অ্যান্ডি লক? বিশ্বাস হয় না!
রয় রোকফোর্ডের ম্যানেজারকে খুঁজে বের করল...
ব্রায়ান, অ্যান্ডির সঙ্গে কথা বলতে পারি?
ভালই হয়, রয়। আমি ওকে বুঝতে পারি না...
...এই নৈপুণ্য, এই গতি, কিন্তু দলের সঙ্গে মিশতে পারে না! সবারই অপ্রিয়!
এই, অ্যান্ডি... ভাল হবে না...
আমার জিনিস ফেলে দিচ্ছ!
দুঃখিত! মনেই ছিল না আজ একগাদা গোল নষ্ট করে তোমার পিঠে ব্যথা হয়েছে!
ও অন্তত চেষ্টা করেছে। তুমি তাও করোনি!
তোমাদের জন্য খেটে কী লাভ? তোমরা তো একটা ভাল সুযোগ দেখেও চিনতে পার না!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

স্মৃতি

শান্তিকুমার দাস

সেই ছোট পথখানি আজো পড়ে মনে
দুইধার ছিল যার ভরা শুধু বনে,
খাল ছিল বিল ছিল আলপথে যেতে
সোনালির সমারোহ ছিল ধানখেতে।

মাছগুলো ঝাঁক বেঁধে খাল আর বিলে,
ছুটোছুটি করত যে ছোট বড় মিলে,
রোদ্দুরে চিকচিক রুপো রুপো খেলা
তাই দেখে দাঁড়াতাম মারতাম ঢেলা।

বগলের বইখাতা বগলেই থাকে,
পড়াশোনা পাঠশালা কেবা মনে রাখে।
কতদিন এইভাবে কেটেছে কে জানে,
তবু আজও পড়ে আছে মন সেইখানে।

আম জাম পেয়ারার করতাম শেষ,
রোদে পুড়ে জলে ভিজে আনন্দে বেশ,
বাতাবিকে বল করে খেলতাম সবে,
বাক্সির মাঠে রোজ মহা কলরবে।

সেদিনের সব স্মৃতি আজ মরা মরা,
পথ আর খাল-বিল-পাথরেতে ভরা,
খড়খড় করে কাটে লোহা ইস্পাত
কাশবনে কালো ধোঁয়া ওঠে দিনরাত।

খাল-বিল গাছপালা ভাল ছিল বেশ
পুরাতন জানি হবে একদিন শেষ,
চলার পথে যে তবু শত স্মৃতি ঝরে
আনমনা করে মন দুঃখেতে ভরে!

বিচ্ছুর সমস্যা

সনৎকুমার মিত্র

আদর করে দিদির ছেলের নাম রেখেছি বিচ্ছু,
অথচ সে দুষ্টুমিটার শিখলই না কিচ্ছু।
কাজ করতে চায় সে শুধু সবাই তবু তাকে
দুধ খাইয়ে লজেন্স দিয়ে ভুলিয়ে দূরে রাখে।
বিচ্ছুও তাই রান্নাঘরে ঢুকে সুযোগ পেলে,
দুধ ফুটছে দু'মুঠো নুন তাতেই দেবে ফেলে।
অথবা ভাত রান্না করা যদি দেখে আছে,
তার উপরে ছাই ছড়াবে পেলেই হাতের কাছে।

তোমরা তাকে কাজ দিলে সে সত্যি হবে খুশি,
কাজ নেই তার কেউ নেই তাই বন্ধু হল পুসি।
পুসিকে তাই করতে খুশি নিজের দুধের থেকে,
একটুখানি লুকিয়ে রেখে পুসিকে দেয় ডেকে।
পুসিটা না দুষ্টু এমন দুধটুকু নেয় খেয়ে,
ঘুমিয়ে পড়ে খাটের নীচে আর দেখে না চেয়ে।
যে বন্ধু তার জন্যে এত করল উপকার,
ভাবে না হায় কেমন করে কাটবে সময় তার!

কী আর করে বিচ্ছু উঠে জানলাটিকে খুলে,
তাকিয়ে দেখে গাছের ডালে সবুজ টিয়া দুলে
করছে খেলা, বিচ্ছু তাকে ডাকতে গেলে কাছে
আর সে টিয়া পালিয়ে গিয়ে বসল আরেক গাছে।
বিচ্ছু ভাবে কী করে হায় কাটবে সময় তার,
বলতে পারো? তা হলে হয় ভীষণ উপকার।

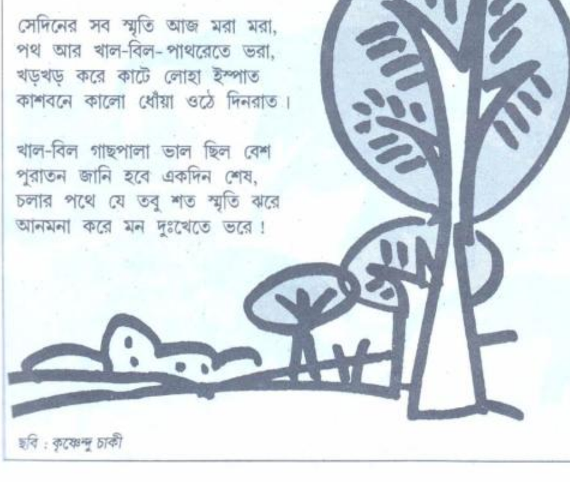

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পূর্ণ উপন্যাস

সাধুচরণের বাঙাল

শিবতোষ ঘোষ

দলমা পাহাড় থেকে একপাল হাতি হঠাৎই ঠিকানাহারা হয়ে ঢুকে পড়েছে। পাঁচগেড়্যার আশপাশের প্রায় বিশটা গ্রাম এখন হাতির কবলে, সবাই হাতির ভয়ে তটস্থ।

এসব অঞ্চলের যে জঙ্গল, তা প্রায় দু' পুরুষ হয়ে গেল সব নিরীহ জঙ্গল। ওই দেড়-দু' বছর অন্তর-অন্তর নেকড়ে-নেকড়ে শুনত বটে, কাদের ছাগল নিয়ে গেছে, কাদের কচি বাছুর মেরে ফেলেছে, তাও পাঁচগেড়্যার পাঁচ-ডোবা পেরিয়ে কখনও সেসব নেকড়েও আসেনি। তাই হঠাৎ করে এই বিশালদেহী জন্তুটির আক্রমণের খবর শুনে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছে সকলে।

"হ্যাঁ গো, হাতি কি হিংস্র ?"

"হিংস্র নয়তো কী ? নেপ্‌রার বিজয় পাতর যে উনুন ধরাবে তারও দু' আঁটি খড় নেই তার গাদায়, সব খেয়ে গেছে। চৈতা এত বড় গ্রামটায় একটা কলাগাছ নেই ! বিশ্বাস করবে না কাদের বাইরে ঢেঁকিশাল ছিল তার আঁকশলিসুদ্ধু উপড়ে নিয়ে গিয়ে মরাইয়ের দরজা ভেঙেছে, ভেঙে সমস্ত ধান খেয়ে গেছে।"

"না গো, আমি কার কাছে শুনেছিলাম যারা নিরামিষ খায়, তারা নাকি হিংস্র হয় না।"

তা হলে হাতিও বুঝে গেল এ-পৃথিবীতে হিংস্র হওয়া ছাড়া টিকে থাকার কোনও উপায় নেই, হয়তো-বা।

স্কুল বন্ধ, এ-তল্লাটের একমাত্র প্রাইমারি স্কুল বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক কানাইবাবু ও পরিতোষবাবু, দু'জনেই সাইকেলে আসেন, হাতির ভয়ে এখন আর আসছেন না, শালবনির মোড়ে চায়ের দোকানে বসে, দু' কাপ চা খেয়ে, হাতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে বা গল্প করে বাড়ি ফিরে যান।

"কী রে, আজ হাতির খবর কী ?"

গ্রামের চায়ের দোকান মানে রেডিও স্টেশন।

চায়ের দোকানের পল্টুছোকরা বলল, "হাতি আরও এগিয়েছে মাস্টমশায়।"

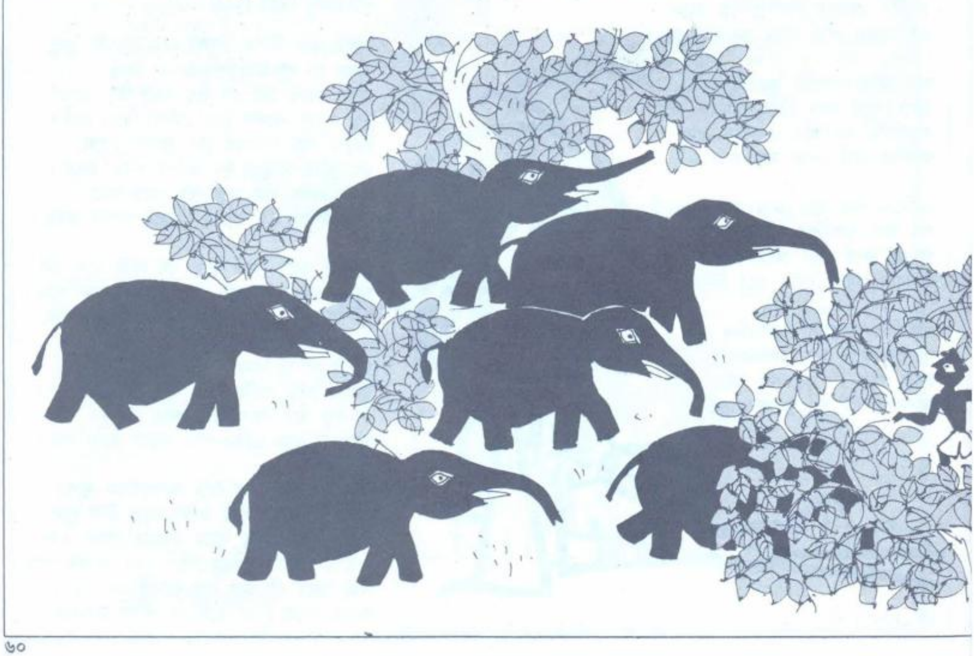

"কদ্দুর রে ?"

"ত্রিফলার জঙ্গল পেরিয়ে এসেছে।"

"তা হলে ইস্কুলে যাওয়া বিপজ্জনক বলছিস ?"

"বিপদ মানে লোকে ঘর থেকেই বেরোচ্ছেনি, লোকে ছেলেপিলেদের কি হাতির পায়ে চ্যাপটা হতে পাঠাবে ?"

কেউ বলছে, "মাস্টমশায়দের ভাল হয়েছে, একটা দরখাস্ত লিখে দিয়ে ঘরে বসে থাকলেই মাইনা পেয়ে যাবেন।"

এমনিতে এসব জায়গার স্কুল পড়াশোনার জন্য নয়, ভোটের জন্য। এই তো সেদিন ভোট গেল, এখন কাজকর্মও হাল্‌কা, অতএব কানাইবাবু ও পরিতোষবাবুর কোনও উৎকণ্ঠা নেই।

"ইস্কুল-মিস্কুল বন্ধ হয়ে মরুক, পড়ে তো সব তালুক করছে, কিন্তু হাটবাজার যে সব বন্ধ হয়ে গেল গো, খাব কী ?"

"আর বলোনি গো খুড়িমা, ভাই তিন বছর পর নিতে এসেছিল, তাও যেতে পারলামনি ওই হতচ্ছাড়া হাতির জন্য।"

হাতির ভয়ে সকলের সব বন্ধ, ঠাকমা-বুড়ি তো দরজা পর্যন্ত খুলছে না, বাইরে দুম করে কারও আছড়ে পড়ার শব্দ হলেও হাতি-হাতি বলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে।

একমাত্র পিন্টা-মিন্টাদের সব খোলা, তারা বাগাল, তাদের হাতি কী, আর বাঘ কী।

পিন্টাকে এখন গোরু চরাতে নিয়ে যেতে হচ্ছে না, তা পিন্টার জন্য নয়, পাছে গোরুগুলোর কিছু হয়। অধর সাঁইয়ের গোরু বাঁধা ছিল খালপাড়ে। হাতির পাল, নামই গজেন্দ্রগমন, হেলতে-দুলতে আসছিল, গোরুগুলো দেখে ভয় পেয়ে যে-যার মতো দড়ি ছিঁড়ে, গোঁজ উপড়ে পালান তো পালান, যেতে পারল না কেবল একটা সতেরো-আঠারো মাসের বকনা বাছুর। হাতির দল ঘিরে ফেলেছে

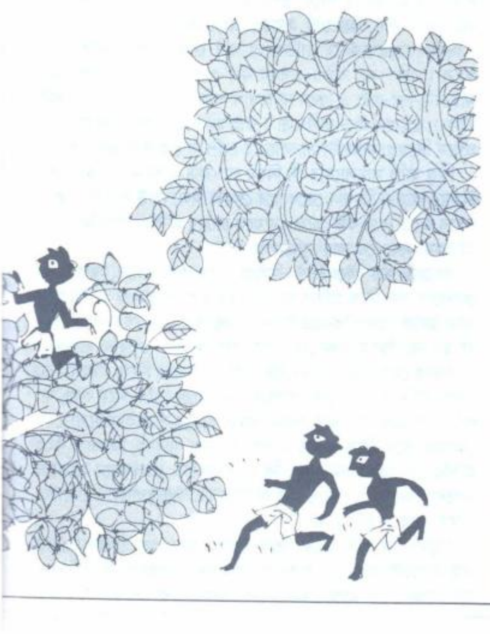

তার চারদিকে। হাতির দল ঘুরছে আর বাছুর বেচারি মরিয়া হয়ে পাগলের মতো এদিক-সেদিক ... ওইরকম লাফাতে-লাফাতে পায়ে দড়ি জড়িয়ে পড়ে যায় এবং সেদিন সন্ধেবেলা গৃহস্থ খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখে, কী করে পেটে পা তোলা হয়ে গেছে হাতির, ভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে বাছুরটার।

এই ভয়ে কেউ আর বাইরে গোরু নিয়ে যেত না। সাধুচরণের গোরুও বাড়িতে। কিন্তু এর ফলে আরও কাজ বেড়ে গেল পিন্টা-মিন্টার। "যা, গোরুর ঘাস কেটে নিয়ে আয় !" অতগুলো গোরুর ঘাস, দুটো বাচ্চা ছেলে, হাতির ভয় তো এদেরও আছে। "যা, ছাগলের জন্য পাতা কেটে নিয়ে আয়।" গোরু-ছাগল, মুদি দোকান, এমনকী, ঠাকমা-বুড়িকে সাহস দিয়ে পুকুরঘাটে কাপড় কাচতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও এসে পড়ল পিন্টা-মিন্টার ওপর। মরলে বাগাল মরুক, আর কে মরবে।

হাতি আসার ফলে চতুর্গুণ কাজ বেড়ে গেল পিন্টা-মিন্টার। এবং জীবনটাও তাদের আরও চতুর্গুণ মূল্যহীন হয়ে দেখা দিল।

মিন্টা জিজ্ঞেস করছে, "দাদা রে, রা মানে কি হাতি ?"

পিন্টা বলল, "হ্যাঁ।"

কিন্তু আশ্চর্য, পিন্টা-মিন্টা কোনও ঝামেলায় পড়ল না, পড়ল সাধুচরণের মেজোছেলে, পাঁচগেড়্যার এখন সবচেয়ে অবস্থাপন্ন রাখাল পালের ছেলে অশ্বিনী আর পরম ঠাকুর ভক্ত ছাবু দাসের ছেলে মাধাই। দুর্ভাগ্য, এদের সুনামী পিতাদের এই ছেলেগুলো বরাবর একটু হাতচোট ছিল। যখন দেখল হাতির ভয়ে কেউ বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না, ওরা এই ফাঁকে যুক্তি করে বেরোল কাজুবাদাম চুরি করতে। ওরা গাছে উঠে বাদাম তুলছিল, হাতির গোলমালের সূত্রে আরও দু' দিন ওরা এসে-এসে পেড়ে নিয়ে গেছে, এটা তৃতীয় দিন। ওরা হাসাহাসি করছিল এবং বলাবলি করছিল, হাতির গোলমালটা যদি গোটা বাদাম সিজিনটা চলে, তা হলে দারুণ হয়। হিহি, হাহা, এরকম ফাঁকা চুরির সময় চোরেদের ভাগ্যে খুব কম জোটে। কোনও একজন বলল, "গড় কর, এ হাতিঠাকুরের দয়া।"

ঠিক সে-সময়ই হঠাৎ দেখল একটা বিশাল হাতির দল গোটা বাগানটা সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলেছে।

দেখেই, "এই !"

"এ কী !"

তিনজনে একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, "আ-আ-আ ..."

লাফ দিয়ে যে কোনও দিকে পালাবে এখন আর তারও কোনও উপায় নেই। তারা একসঙ্গে গলা ছিঁড়ে চিৎকার করতে থাকল, কাঁদতে থাকল।

তাদের চিৎকার ও কান্নার শব্দে গ্রামের লোকজন বেরোল বটে, কিন্তু বেরিয়েই দ্যাখে হাতির দল ঘিরে ধরেছে নীলমণি ঘোষের বাদাম-বাগানের মাঝের সেই ঝাঁকড়া গাছটাকে। ও ছেলেগুলো নীলমণি ঘোষের গাছে কেন ? বুঝতে বাকি রইল না কারও। ঠাকমা-বুড়ি বলল, "যে জন্য হোক, ছেলাগুলোকে তো উদ্ধার করতে হবে।" কিন্তু কী করে উদ্ধার করবে, তারা যত কাঁদছে, চেঁচাচ্ছে, হাতিগুলো তত আনন্দে মত্ত হয়ে ঠ্যাং তুলে-তুলে নাচছে।

প্রথমে বোঝা যায়নি কাদের ছেলে, দুটো না পাঁচটা তাও কী করে বুঝবে। "এই, সকলে চুপ দ্যাও তো, শুনতে দাও !" আর শোনা, মা-বাপ মাথা খুঁড়ছে, বুক চাপড়াচ্ছে, "ও বাপ দামু রে ...ও বাপ নেতো ... ।" খানিকক্ষণ চলল গোটা গ্রামজুড়ে এইরকম, প্রত্যেকের মনে হতে লাগল তার দামু, তার রামু, এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে সাধুচরণের মেজো নেই, রাখালের অশ্বিনী নেই, আর ছাবু দাসের তো মাধাই অন্ত প্রাণ, এক সন্তান, তবু ছাবু দাস মনে মনে ভাবত :

আকাশেতে লক্ষ তারা তাতে কিবা হয়, এক চন্দ্রে হতে পারে লক্ষ তারা জয়। কিন্তু আজকের ঘটনার পর ভীষণ মুষড়ে পড়ল সে, ছেলেকে এতদিন বৃথাই সৎসঙ্গ দান করে এল ছাবু দাস। তার বুক চাপড়ে কান্নার পেছনে ছেলের উদ্ধার যেমন আছে, তেমনই এটাও আছে, "আমার ছেলে কাজুবাদাম চুরি করতে গেছে, ছি-ছি!"

"আর ছি-ছি করে কী হবে ছাবু, এখন লোকজনকে ধরাধরি করে ছেলে উদ্ধারের ব্যবস্থা করো।"

"হাতি কি গাছটা ভেঙে ফেলবে নাকি গো?"

"হাতি হল পশুরাজ, ওদের শক্তির কাছে নির্জীব গাছ আর ক'দণ্ড টিকবে।"

"হাতি কি পশুরাজ, পশুরাজ তো বাঘ।"

"বাঘ নয় সিংহ।"

এদের ছেলেপুলেরা সব ঘরে অটুট আছে, সুতরাং খানিকক্ষণ পশুরাজ নিয়ে কথা বলতে এদের মন্দ লাগল না।

ছাবু দাস মেলায় কেনা আঠারো আনার রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির পায়ের তলায় পড়ে-পড়ে কাঁদছিল। সাধুচরণ, রাখাল পাল এসে ছাবু

দাসকে তুলে নিয়ে গেল, "কান্নাকাটি করে কিছু হবে? চলো, সবাইকে ডাকাডাকি করে একটা ব্যবস্থা করি।"

"ওদিকে হাতির দল ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে, ধুলো ওড়াচ্ছে, গাছের ডাল ভেঙে ফাবড়া ছুঁড়ছে।"

কিন্তু কী ব্যবস্থা করবে, একজনকে ডেকে এনে আর-একজনকে ডাকতে গেলে আগের জন পালায়, "ওরে বাবা হাতি ...!" হঠাৎ হাতিগুলো অকারণে না কোনও কারণ আছে যে ওই ছেলে তিনটেকে ঘিরে ধরেছে! হাতি কি চোর-চোট্টা সহ্য করে না? তা হলে যে চারদিকে, চারদিকে কত পুকুরচুরি হয়ে যাচ্ছে, আর এ তো সামান্য বাদাম চুরি। না, বোধগম্য হচ্ছে না কারও।

যাই হোক, কোনওক্রমে বিশ-বাইশজন জড়ো হল নিতাইদের খামারে, তেঁতুলতলায়। কেউ আক্রোশভরে বলল, "রাখালদা, কবে থেকে বন্দুক নেবে-নেবে করছ, কৃপণতা করে নিচ্ছনি, এখন তোমার বেটার পেটে যদি বড় হাতিটা পা তুলে দাঁড়ায়, তখন তোমার টাকা কী হবে বলো দিকিনি!"

রাখাল পালকে এই সুযোগে কেউ-কেউ উপদেশও দিয়ে নিচ্ছে, "রাখাল, তুই তোর বেটাকে শহর-বাজারের কোনও ইস্কুলে ভর্তি করে সেখিনেই রেখে দে, টাকা তো লোকে ছেলাপেলা মানুষ করার জন্যই চায়, নইলে আর টাকার মূল্য কী? অসৎসঙ্গে পড়ে তোর বেটা এমন হয়েছে, এখিনে রাখিসনি।"

সাধুচরণ রেগে যায়, "এখন ছেলেদের কীভাবে উদ্ধার করা যায় সেই কথা বলো!"

সে লাঠি নিয়ে কয়েকটা উড়োপাক খেয়েছে, কিন্তু এগোতে সাহস পায়নি।

"এক কাজ করো, বিশ-পঁচিশটা মশাল জ্বালো, আগুনের হলকা দেখলে হাতি পালাবে। যে যাই হোক, আগুনকে সকলের ভয়।"

"কিন্তু অত মশাল জ্বালতে তো একটিন কেরোসিন লাগবে। কনট্রোল দোকানি মদনা মাথাপিছু হাফ লিটার কেরোসিন দেয়।"

"তোমরা তিনজনে ব্ল্যাকে কেনো, ব্ল্যাকে খোঁজ করলে ও মদনাই দেবে।"

"কত করে নিবে রে?"

"যাই নিক, এখন টাকার কথা ভাবলে চলে। যাও, যাও, দেরি কোরো না।"

ছাবু দাস বলল, "আমার কাছে মোটে পঁচিশটি টাকা আছে বিনোদ, হরিবাসর করব বলে রেখেছিলাম, বিশ্বাস করো, আর একটিও ...।"

অনেক দূর থেকে গ্রামের লোকেরা কাতার বেঁধে দেখছিল, এটা একটা অসাধারণ মজার দৃশ্য, হাতির নৃত্য এমনিতে খুব কম লোকেরই দেখার সৌভাগ্য হয়, যারা দ্যাখেন তাদের কাছে বলার মতো একটা ঘটনা পেয়ে গেল পাঁচগেড়্যার লোকেরা। কিন্তু এত মধুর দৃশ্যেও আনন্দ প্রকাশ করতে পারছে না কেউ। ছেলে তিনটের যে মরণ-বাঁচন সমস্যা। কোনও বাচ্চা হাসলেও তার মা বকছে, "চুপ, সাধুখুড়ার মা শুনতে পাবে, তখন বাখানে-বাখানে ...।" হাসির দৃশ্য নয়, করুণ দৃশ্য হিসেবেই সকলে গ্রহণ করল।

কিন্তু তাড়াতে গিয়ে হাতিগুলো যদি রেগে গ্রামের দিকেই ছুটে আসে। যদি ...না, যদিও এখানে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কথায় বলে অগ্নি-বায়ু-শিং-ধারী, এ-তিনে না বিশ্বাস করি। যাঃ, হাতি কি শিং-ধারী নাকি? ওই হল শুঁড়-ধারী তো। তাই হাতি তাড়াতে যাওয়ার আগে প্রথমে নিজের নিজেরটা সামলানোয় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল সকলে।

কিন্তু হাতি সামলানোর কী নিয়ম তা কেউ জানে না। কেউ-কেউ উঠোনে ঝুড়ি-ভর্তি ধান রেখে ঘরে শেকল দিল, কেউ কলাগাছ কেটে বাইরে জড়ো করে বউ-ছেলে-মেয়েকে চালের মটকায় তুলে দিয়েছে। এইরকম সব, যে যার বুদ্ধিমতো।

সবচেয়ে ঝড় বইছে পিন্টা-মিন্টার ওপর, ওরা বাগাল, সাধুচরণের ছেলেদের বাদ দিয়ে হাতির দল যদি এই বাগাল দুটোকে ... তা হলে এখন ব্ল্যাকে তেলও কিনতে হত না, কিচ্ছু না। কেন যে মানুষ যা চায় তা হয় না, কিংবা কেন যে বাগালদের দিকেও ভগবান থাকেন!

বাড়ির যে পারছে ওদের ঠেলে বাইরে বার করে দিচ্ছে, "যাবি তো, এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী শুনছিস। যা, ওকে ডেকে নিয়ে আয়, যা, পল্টুকে আমার নাম করে বলবি ওদের পাড়ার তীর-কাঁড়গুলো যেন জোগাড় করে নিয়ে আসে। ফেরার সময় রাধুকে জিজ্ঞেস করে আসবি তো কেরোসিন আছে কি না। এক টিন তেল মানে সতেরো বোতল, তিন-পাঁচে পনেরো, তা আমাকে তো পাঁচ বোতলও জোগাড় করতে হবে। দৌড়ে যা!"

ঠাকুমা-বুড়ি গাল দিচ্ছে, তার শরীরে আর অশ্রু রাখার জায়গা নেই, মর্মভেদী কান্না এবং কর্কশ গালাগাল দুটো একসঙ্গে সমপরিমাণে বয়ে যাচ্ছিল, যা আগে কেউ কখনও দেখেনি বা শোনেনি। অবশ্য

গ্রামের সকলকেই হাতির পাল একটু-না-একটু বদলে দিয়েছিল, পিন্টা-মিন্টা তো ছেলে তিনটের জন্য জান দিয়ে দেবে এরকম অবস্থা।

ঠাকমা-বুড়ি কেঁদে-কেঁদে পিন্টা-মিন্টাকে গালাগালের সঙ্গে বলল, "ওরে, তোদের কেউ একজন দৌড়ে যা না রে, আমার নাম করে পুরোহিতটাকে ডেকে আনবি।" কেউ জিজ্ঞেস করল, "ঠাকুমা, এখন পুরোহিত কী করবে?" ঠাকুমা-বুড়ি তেমনই কাঁদতে-কাঁদতে এবং বাখান দিতে-দিতে হাত জোড় করে বলল, "হাতিঠাকুরের পুজো দিলে কি আর উনি শান্ত হবেন না।"

পিন্টা অনেক আগেই চলে গেছে তীর-ধনুক আর কেরোসিন জোগাড় করতে। শুনে মিন্টা ছুটল গিড়গিড় করে পুরোহিত ডাকতে। কিন্তু গিয়ে দ্যাখে, পুরোহিত তাদের সামনে যে সরু জামগাছটা পেয়েছে, ওতেই উঠে বসে আছে। মিন্টার দপদপ পদভারে ছুটে আসা শুনেই পুরোহিত আ-আ করে এমন আর্ত কণ্ঠ বের করল যে, মিন্টারও মনে হল সামনে কোথাও হাতি আছে। কিন্তু এত শিশুর পা-ও যে কী করে হাতি হয়ে যায়।

পুরোহিত গাছ থেকে নামছে না, একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছে, ওতেই বেঁধে মুড়ি-জল সরবরাহ হয়েছে, বিড়ি-আগুন সরবরাহ হয়েছে।

পুরোহিত জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কে তুই?"

তাকে চেনে কিন্তু সে তো এইমাত্র এত বড় ঘাবড়ানো থেকে উঠেছে, তার মেয়ে-বউ বেরিয়ে এসে কথা বলতে তবে তার চোখ খুলে তাকাতে সাহস হয়েছে।

পুরোহিতের স্ত্রীই বলে দিল, "ওকে চিনতে পারছ না, ও তো সাধুচরণের বাগাল।"

কিন্তু দেখতে দেখতে গ্রামের আরও বহু লোক এসে জড়ো হল পুরোহিতের গাছের নীচে, প্রত্যেকের ওই একই আর্জি—হাতিঠাকুরকে যদি কোনওভাবে শান্ত করা যায়। এর জন্য সমস্ত গ্রামবাসী আজ এক টাকা-দু টাকা করে চাঁদা দিতেও রাজি। ভূমিহীন খেতমজুর একটাকা, বাদবাকি ....

"না গো, এর মধ্যিখানে আর একটা থাকা দরকার, ধরো রাখাল পালও দেবে দু' টাকা, আমিও দেব দু' টাকা, এ হতে পারে না।"

সর্বসম্মতিক্রমে মাঝখানে আর একটা থাক করা হল, দেড় টাকার থাক।

পুরোহিত সব শুনে গাছের ডাল থেকে বলল, "কিন্তু আমি কী করে শান্ত করব?"

"হাতিপুজো করুন, হাতিঠাকুরের পুজো, আকুলঠাকুর পুজো করার পরই নাকি উপরডাঙা থেকে হাতির দল সরে এসেছে।"

পুরোহিত রেগে গেল এবং যাই হোক রাগ সামলে নিয়ে বলল, গাছে বসে বেশি রাগ বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কোথায় হাতছাড়া হয়ে গেলে ... "আকুলঠাকুর যে হাতিপুজো করল, বলি মন্ত্র কোথায় পেল, হাতিপুজোর কোনও মন্ত্র আছে? সকলকে ভাঁওতা দিয়েছে।"

"যাই করুক, হাতিগুলো তো সরে গেল।"

"আর হাতিঠাকুরের মন্ত্র নাই-বা কেন, তিনি তো লক্ষ্মীঠাকুরানির বাহন।"

"হাতি বাহন না পেঁচা বাহন গো লক্ষ্মীর?"

বড় গোলমালের মধ্যে পড়ে যায় সকলে। হাতি না পেঁচা? পা তুলে হাতির উপর বসে আছেন এমন ছবি আমি দেখেছি, কালীদের বাসন দোকানের এক বছর ক্যালেন্ডার হয়েছিল।"

পুরোহিতকে হাতিপুজো করতেই হবে, ছাড়াছাড়ি নেই, চাল-কলা-দক্ষিণার সময় তো ঠিক ...তখন তো ...আরে, যজমানের

যে হিত করে সেই হল পুরোহিত, প্রধান হিতসাধনকারী। হাতিপুজো না করলে এই গ্রামের যাবতীয় পুজোআচ্চা সব আকুলঠাকুরকেই দিয়ে দেওয়া হবে। তাড়িয়ে দেওয়া হবে গ্রাম থেকে—বদমাইশি!

পুরোহিত বাধ্য হয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমি ওই লক্ষ্মীর বাহনেরই মন্ত্র বলব, সে পেঁচা পাক আর হাতি পাক। তবে পুজোটা হবে কিসে, হাতির তো একটা মূর্তি চাই।"

"তোরা কেউ একজন আমাদের গোষ্ঠার কাছে ছুটে যা, গিয়ে তাকে বল এক্ষুনি একটা হাতিঠাকুর বানিয়ে দিতে হবে, করে দেবে গোষ্ঠা।"

"গোষ্ঠ পারবে?"

"হাতি কি, ওকে বলল হাতির ওপরে মা-লক্ষ্মীকেও বসিয়ে দেবে। ইস্কুলের মাস্টমশায়রা তো বলেন, আমাদের গোষ্ঠর নাকি খুব ভাল আর্ট হবে।"

সকলে প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "না, শুধু হাতি, হাতির ওপরে লক্ষ্মী বসালে তো সে লক্ষ্মীঠাকুর হয়ে যাবে, আমাদের এখন শুধু হাতিঠাকুর চাই।"

পুরোহিত বলল, "তোমরা সকলে বলছ, আমি পুজো করে দেব, তবে আমার মনে হয় তোমরা গিয়ে পুণ্যকে একবার ধরো, ও তো

ইলেকট্রনিক্স গেম

কাঁচি-কাগজ-পাথর নিয়ে খেলা

এটা একটা দারুণ মজার ইলেকট্রনিক গেম। এই খেলায় প্রত্যেক প্রতিযোগী নির্বাচন করবে কাঁচি, কাগজ অথবা পাথর। কিন্তু কোনটা সে নির্বাচন করেছে তা কাউকে জানাবে না, গোপন রাখবে। খেলায় কে জিতবে সেটা বোঝা যাবে সিগন্যাল আলো জ্বলে উঠলে। কাঁচি জয়লাভ করবে কাগজের উপর কেননা কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটা যায়। আবার পাথর জয়লাভ করবে কাঁচির উপর কেননা পাথর দিয়ে কাঁচিকে শান দেওয়া যায়। আবার কাগজ হারিয়ে দেবে পাথরকে যেহেতু কাগজ দিয়ে পাথর মুড়ে নেওয়া সম্ভব। কাজেই এই প্রতিযোগিতায় কে জয়ী হবে সেটা নির্ণয় করা খুবই সহজ ব্যাপার।

নীচে একটা তালিকা দিয়ে বোঝানো হল তোমাদের সুবিধার জন্য। সমস্ত 'কম্বিনেশন' একমাত্র ড্র-এর পরিস্থিতি ছাড়া এইরকম হবে:

কাঁচি বনাম কাগজ—জিতবে কাঁচি
কাগজ বনাম পাথর—জিতবে কাগজ
পাথর বনাম কাঁচি—জিতবে পাথর
কাঁচি বনাম পাথর—হারবে কাঁচি
কাগজ বনাম কাঁচি—হারবে কাগজ
পাথর বনাম কাগজ—হারবে পাথর

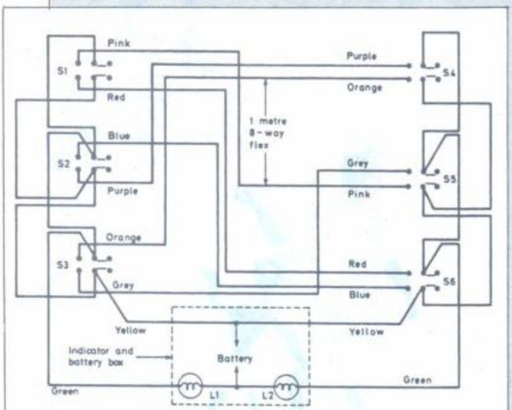

কাঁচি-কাগজ-পাথর ইলেকট্রনিক্স গেম খেলার সার্কিট

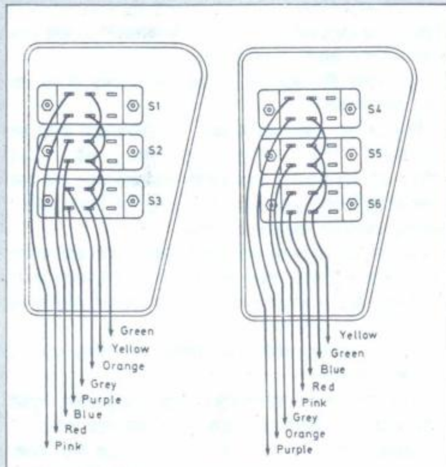

হ্যান্ড ইউনিটের ভিতরে তারের সংযোগ

শুধুমাত্র দুটো সুইচ ইউনিট এবং একটা ব্যাটারি বাক্সর সাহায্যে (ইনডিকেটর) এই খেলা খুব সহজেই দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

সার্কিট

চিত্র 1. 1-এ সার্কিট ডায়াগ্রাম দেওয়া হয়েছে। S1, S2 এবং S3 হচ্ছে কাঁচি, কাগজ ও পাথরের সুইচ। প্রতিযোগীকে এই সুইচ টিপতে হবে। আর S4, S5, S6 হল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাঁচি, কাগজ ও পাথর নির্বাচন করবার জন্য সুইচ। যদি প্রথম প্রতিযোগী জয়ী হয় তা হলে L1 ল্যাম্প জ্বলে উঠবে। আর যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী জয়লাভ করে তবে L2 ল্যাম্প জ্বলবে। যদি ড্র হয় তা হলে কোনও আলোই জ্বলবে না।

একটা হাত দিয়ে S1, S2 এবং S3 এই সুইচ ইউনিট অপারেট করা যাবে। আর প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড় অপারেট করবে S3, S4 এবং S6 সুইচ ইউনিট (চিত্র 1. 2); এই ইউনিট এবং ইনডিকেটর ব্যাটারি বক্সের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ঘটবে 8-ওয়ে রঙিন ফ্লেক্সিবল্ তারের

অনেক রকম মন্ত্র জানে, হয়তো হাতি তাড়ানোর মন্ত্রও জানে।"

কিছু লোক ছুটল পুণ্যকাকার কাছে।

পুরোহিত গাছ থেকেই চেঁচিয়ে ডাকল, "সাবিত্রী!"

সাবিত্রী পুরোহিতের স্ত্রী।

"আমার কোশা-কুশি-ঘণ্টাটণ্টা ধুয়ে, আর চাট্টি ফুল একসঙ্গে বেঁধে আমাকে তুলে দেবে, আমি এই গাছে বসেই হাতিপুজো করব।"

পুণ্যকাকা লাথি-মারা গাই ঠিক করে দেয়, কুকুর-শেয়াল কামড়ানোর ওষুধ দেয়, ফুঁ দিয়ে বাঘা-মউয়ের চাক ভাঙে, নিতাইদের অত বড় মোষ গাড়ির জোয়াল কাঁধে তুলে দিলেই একা ছুটত, গাড়ি ভাঙুক আর মানুষ মরুক, তাকে পর্যন্ত মন্ত্রগুণে ঠিক করে দিয়েছে পুণ্যকাকা। পিন্টা-মিন্টার কাছে এমন গল্পও করেছে, "গল্প নয় রে, শুন তবে। সাপকাটি হয়েছে নরম ডাঙার জমিদার কামিলাপ্রসাদের ছেলেকে, এক ছেলে। ওঝা, বদ্যি সবরকম করেছে, কিন্তু কে কী করবে, ও সাতপাটি-মণ্ডলকুলির বিদ্যে জানা লোকের চালা সাপ। জমিদারের সঙ্গে তো কত লোকের কত কিছু গণ্ডগোল, কেউ রাগের চোটে গুনিন ধরে দিয়েছে সাপ চেলে। বুঝলি, একেবারে শেষ সময় আমার দুয়ারে এনে ফেলে দিল। আমি রোগী দেখেই বুঝতে পারলাম, এ আমার কম্ম নয়।

পার্থসারথি চক্রবর্তী

সাহায্যে।

এবার ধরা যাক, S1 সুইচ টিপে বাঁ দিকের প্রতিযোগী নির্বাচন করল কাঁচি। এর ফলে হলুদ থেকে লাল পর্যন্ত সমস্ত সার্কিট এবং সবুজ থেকে গোলাপি পর্যন্ত S1-এর সার্কিট বন্ধ হয়ে যাবে। এবার মনে করো—ডান দিকের প্রতিদ্বন্দ্বী S5 সুইচ টিপেছে কাগজ নির্বাচন করে। সার্কিটের চেহারা তা হলে এখন এইরকম দাঁড়াবে : যেহেতু S6 open (অর্থাৎ অফ্) কাজেই ব্যাটারি ভায়া হলুদ এবং S1 থেকে লাল অংশ কাজ করছে না। ব্যাটারি সার্কিট via L1, সবুজ, S1 থেকে গোলাপি এবং যেহেতু S5 closed, গোলাপি থেকে হলুদ S5 ও ব্যাটারিতে যাচ্ছে। কাজেই L1 ল্যাম্প জ্বলবে।

আবার মনে করো, S1 নির্বাচন করা হয়েছে কিন্তু ডান দিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী 'পাথর'-এর জন্য S6 টিপেছে। এবার সার্কিটের অবস্থা দাঁড়াবে এইরকম : ব্যাটারি via হলুদ থেকে S1, S1 থেকে লাল, S6 পর্যন্ত এবং via S6 থেকে সবুজ, L2 থেকে ব্যাটারির মধ্যে দিয়ে কারেন্ট বইবে যাতে L2 জ্বলতে পারে। গোলাপি সার্কিট via S1 এখানে কাজ করছে না, যেহেতু S5 open ;

এইরকম নানা ধরনের সার্কিটের সম্ভাবনা রয়েছে—প্রতিযোগীদের সুইচ নির্বাচনের উপরই অবশ্য সেটা নির্ভর করবে। ডায়াগ্রামের রঙিন তারের সংযোগস্থল দেখে নিয়ে তারপর ঠিকভাবে তার জুড়তে হবে—যাতে কোনও ভুল না হয়।

হ্যান্ড ইউনিট সুইচ

চিত্র 1.3 দ্যাখো। হ্যান্ড কন্ট্রোল বক্সে প্রত্যেকের তিনটে করে সুইচ রয়েছে। সুইচের জন্য ড্রিল করে একটা অথবা দুটো গর্ত করতে হবে। একটা ছোট ফ্ল্যাট ফাইলের সাহায্যে ঠিকমতো যাতে সুইচ লিভার বসানো যেতে পারে তার ব্যবস্থা করাও দরকার। এটা করা হয়ে গেলে দুটো ছোট নাট-বোল্ট দিয়ে সুইচগুলো আটকে দাও। প্রত্যেকটি সুইচ-ই যাতে সহজে অপারেট করা যায় তা চেক করা প্রয়োজন।

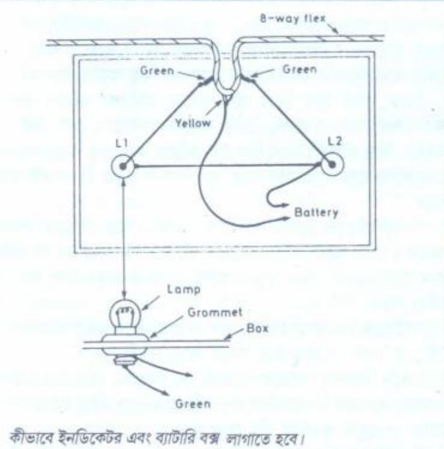

কীভাবে ইনডিকেটর এবং ব্যাটারি বক্স লাগাতে হবে।

তারগুলো হবে Standard flat multiway, এর সঙ্গে পাশাপাশি individual coloured flexible conductors থাকবে। চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকম S1, S2, S3-এর tag জয়েন করো। colour coded তারগুলো তা হলে সামান্য দূরে থাকবে, এদের ঠিকমতো কেটে নিয়ে সলডার করো।

এখানে একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখবে। সেটা হল একটা হ্যান্ড ইউনিটের ওয়্যারিং-এর colour কোনক্রমেই যেন অন্য ইউনিটে ডুপ্লিকেট না হয়। case এমনভাবে ফাইল করো যাতে তার মধ্যে দিয়ে cord প্রবেশ করতে পারে। তারপর পিছনে স্ক্রু-এর সাহায্যে ফিট করে দাও। সুইচের লেবেল এইরকম হবে : কাঁচি S1, S4 ; কাগজ S2, S5 ; পাথর S3, S6.

ইনডিকেটর বক্স

ইনডিকেটর বক্স একটা সুবিধাজনক সাইজ যেমন 150×100×50 মিমি গভীর হবে। এটা কোনও ধাতু অথবা অন্য-কিছু দিয়েও তৈরি করতে পারো। চিত্র 1.4-এ এর যাবতীয় কানেকশন দেখানো হয়েছে। ভাল করে ছবি দেখে সেইভাবে grommet-এর ভিতর দিয়ে বাল্ব পুশ করে দাও। এবার leads গুলো সরাসরি সলডার করতে হবে। প্রয়োজন মনে করলে ল্যাম্প হোল্ডারও অবশ্য ব্যবহার করতে পারো।

Cord-এর সবুজ এবং হলুদ কনডাকটর সাবধানে অন্য leads গুলি থেকে আলাদা করো। হলুদ তারের ইনসুলেশন সরিয়ে দাও এবং এটাকে এমন একটা lead-এর সঙ্গে সলডার করা দরকার যেটা সরাসরি ব্যাটারিতে গিয়েছে। সবুজ lead কেটে দাও এবং তারের সঙ্গে সলডার করো যেটা L1 ও L2তে যাবে। জয়েন্ট-এ টেপ বসিয়ে যেখানে ইনসুলেটেড স্লিভিং দরকার—পরিয়ে দাও।

ল্যাম্পগুলো হবে 3.5 V 0.3 A এবং টু-সেল 3 V ব্যাটারি ব্যবহার করবে।

চেক আপ

সার্কিটে 'হার' অথবা 'জিত' কীভাবে হবে সেটা আগেই বলা হয়েছে। যদি কোনও ল্যাম্প না জ্বলে তা হলে অবশ্যই তার কানেকশন ঠিক আছে কি না তা ভাল করে চেক করে নেবে। সুইচ সার্কিটে কোনও ভুল থাকলে সেটাও চেক করা প্রয়োজন।

যেসব উপকরণ চাই

S1-S6 6টা ছোট ডাবল পোল ডাবল থ্রো অথবা 2 পোল 2 ওয়ে স্লাইড সুইচ ; বক্স 150×100×50 মিমি ; বাল্ব ব্যাটারি এবং মালটিওয়ে কর্ড ; 2 Off ভেরো হ্যান্ড হেল্ড কেস।

শব্দসন্ধান

রঞ্জন

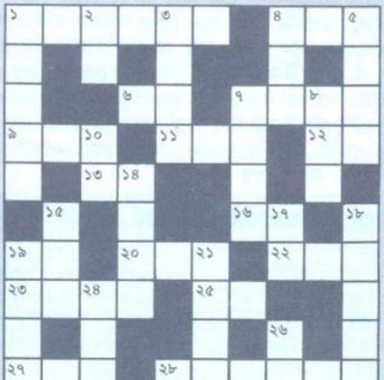

সংকেত : পাশাপাশি : (১) আমি কী ? (৪) বাঘের ডাক। (৬) সাদা। (৭) পাইক। (৯) ভারবাহী প্রাণী। (১১) 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'—এমন বললে কেমন কেনাকাটা বোঝায় ? (১২) মিত্র। (১৩) তরল বস্তু। (১৬) গালা। (১৯) ছাগী। (২০) '—বনে কলুদ ফুল⋯'। (২২) কেউ দেয়, কেউ পায়। (২৩) ঝাঁটিফুল বা গাছ। (২৫) সিংহযোগে বুদ্ধদেব। (২৭) অস্থায়ী। (২৮) বনফুলকে আর কী বলা যায় ?

উপর-নীচ : (১) আধা গ্রাম আধা শহর। (২) ব্রহ্মার পুত্র। (৩) তাসের গোড়ায় মাছের নাম। (৪) হাতির পিঠে চৌকি। (৫) মণিবিশেষ। (৭) পায়ে হেঁটে গমন। (৮) অন্ধকার। (১০) এমন লোকের ব্যবহারটিও এমন। (১৪) মেঘ, পর্বত। (১৫) সুকুমার রায়ের গল্পে সজারু কাঙ্গারু দেবদারু সব হতে পারে, এটা কেন হবে না ? (১৭) পার্বতী। (১৮) কাঁচা খাও, ভাজা খাও, পুষ্টি অশেষ। (১৯) অপ্রতুলতা, অভাব। (২১) রাবণ। (২৪) অসমতল। (২৬) বাচ্চা মেয়েকে আদরের সম্বোধন।

গত সংখ্যার সমাধান

অ	ম্ল	জা	ন			ম	হা	কা	ব্য
শ			দ	ধি	ক	র্মা			ঞ্জ
নি	র	ঞ্জ	ন			হ	ন্য	মা	ন
	ত্না		দী			ত		র	
	ক	ঙ্ক		ড	ন		চা	কু	
ক্ষু	র		থ	র	থ	র		টে	র
ৎ		ক্ষে	ম			সু	র্মা		ঘু
পি	ক		ক	লি	কা	ল		বু	ন
পা	দ	প		খ	ত		আ	ক	ন্দ
সা	ম		অ	ন	র	ণ্য		নি	ন

"বিশ্বাস কর, চাঁদ-সুয্যির নীচে বসে বলছি, জমিদার আর জমিদার-গিন্নি দৌড়ে এসে আমার পা-দুটোয় দু'জন পড়ে গেল, 'আমাদের সর্বস্ব দেব, একশো বিঘে নিষ্কর দো-ফসলি জমি তোমার নামে লিখে দিচ্ছি, যে-কোনও গতিকে আমার ছেলেকে ভাল করে দাও।' তাদের আকুলি-বিকুলি ও দু' নয়নের ধারা দেখলে কোনও মানুষ সেখানে দাঁড়াতে পারবে না।

"তোদের কাকিকে জিজ্ঞেস কর, সেও বলল, 'দ্যাখো শেষ চেষ্টা করে'। আমি দু' কলি চাপড়সার মন্ত্র দিয়ে ⋯চাপড়সার কী জানিস, নিজের শরীরে নিজের কষ্ট ডেকে আনা, মনে হবে ঠিক যেন হাজারজন মিলে তোকে চাপড় মেরে যাচ্ছে। তবু মুখ বন্ধ করে সহ্য করে যেতে হবে, কী আর করব, মানুষের জন্য তো মানুষকে কিছু ছাড়-অছাড় দিতেই হয়। এই মন্ত্রের একটাই কাজ, জীবন জিনিসটাকে টিক-টিক করে হলেও টিকিয়ে রাখবে। যম পর্যন্ত এ-মন্ত্রকে ভয় পায়।

"আমার তো আর কিছু করার ক্ষমতায় কুলাচ্ছেনি, যদি গুরুদেব কিছু করতে পারেন, তাঁর কামরূপ-কামাখ্যার বিদ্যা, কিন্তু অতদূর রাস্তা যাব কী করে ?"

পিন্টা-মিন্টা জিজ্ঞেস করল, "কতদূর ?"

"তেলভাঙার নাম শুনেছিস ? সাইকেল একটা আমাদের গ্রামে আছে বটে, রাখাল পাল সেই নতুন সাইকেল কিনেছে। কিন্তু রাখাল পাল ছাড়া কেউ তো চালাতেও জানে না, রাখাল পাল বড়লোকের ছেলে, সে কী ⋯

"তোদের কাকি বকল, 'তুমি এখনও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছ। মানুষের জীবন বাঁচানোই তো মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ্জি।'

"জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা অল্প-সময়ের রাস্তা আছে, আমি এক হাতে একটা লণ্ঠন, এক হাতে একটা মন্ত্রানো ছড়ি নিয়ে কোনওরকমে জামাটা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আসার সময় তোদের কাকিকে বলে এলাম, 'তুমি জাগোলি থাকবে, কেউ যেন রোগীকে না ছোঁয় আর পিপড়া যেন না লাগে। ছুটতে লাগলাম।"

"তারপর ?"

"আরে গুনিন হই আর যেই হই, মানুষ তো আর ঘোড়ার মতো দৌড়তে পারবেনি, আমার পৌঁছাতেই রাত দুপ্পর হয়ে গেল। বুড়া মানুষ খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে ডেকে তুলে সব কথা খুলে বললাম। শুনে বললেন, 'ইস, বড় দেরি করে ফেলেছিস বেটা। সবুর, আগে ওর পরমায়ুটা দেখে নি' পরমায়ু না থাকলে আমি তো কোন ছার, বিষহরি জল নিয়ে মা-মনসাও কিছু করতে পারবেনি।'

"এক থালা জল নিয়ে তার ওপরে প্রদীপের আলো ফেলে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন, দেখে বললেন, 'না ভয় নেই, এই নে ওষুধ। কিন্তু যাবি কী করে, রাত তো গড়িয়ে এল, সুয্যি ওঠার আগেই যে-কোনওভাবে খাওয়াতে হবে, না হলে ওষুধের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে।'

"আমি আঁতকে উঠলাম, তা হলে ? এখান থেকে দৌড়াতে আরম্ভ করলেও বেলা আটটা-ন'টার আগে ⋯তা হলে কি আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে ! এমন ফুলের মতো সুন্দর নয়নকুমারকে বাঁচাতে পারব না।

"আমাকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে দেখে গুরুদেব বললেন, 'কী রে বেটা, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লি যে ?'

"আমি বললাম, 'গুরুদেব আপনি যে বললেন, ছেলেটার অঢেল পরমায়ু, তা হলে কি আপনার গণনা মিথ্যা। সুয্যি উঠার আগে আমি তাকে এ-ওষুধ খাওয়াব কী করে ?'

"গুরুদেব হেসে বললেন, 'বেটা, আয়ু এমনই জিনিস যে ঠিক

একটা-না-একটা উপায় বের হবেই। আয়, তোকে গাছ উড়ানো বিদ্যা শিখিয়ে দিই, তুই গাছ উড়িয়ে নিয়ে চলে যা।'

"বিশ্বাস কর, ও-গাছ আমি আর কোথাও দেখিনি। গাছটার তলায় নিয়ে গিয়ে আমাকে দাঁড় করিয়ে মোটে ছ' লাইনের মন্ত্র, আমাকে শিখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ হল কামরূপ-কামাখ্যা থেকে আনা গাছ, আমি এই গাছে চড়েই কামাখ্যা থেকে এখানে আসি। এ গাছ আর কোথাও পাবি না। কামাখ্যার একজন মন্ত্রসাধক ধ্যানে এর মাত্র ছ'টি বীজ পেয়েছিলেন, সেই ছ'টি বীজ থেকে ছ'টি গাছ জন্মায়, এসব গাছে কখনও ফুল-ফল হয় না। আমার গুরুদেব তিনি আমার সেবায় ও মন্ত্রজ্ঞানে খুশি হয়ে আমাকে তাঁর এই গাছটি উপহার দিয়েছিলেন।'

"গুরুদেব একটু থেমে বললেন, 'পুণ্য, আজ আমি তোমার কাজে মুগ্ধ হয়ে এই মহামূল্যবান গাছটি তোমাকে উপহার দিচ্ছি।'

"গুরুদেব!" আমি হাঁটুমুড়ে গড় হয়ে প্রণাম করলাম।

"গুরুদেব মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, 'তুমি এরকম শিষ্য তৈরি করো যে, মানুষের ভালর জন্যে জীবন উচ্ছুগ করবে, তাকেই তুমি গাছটি দিয়ে দেবে। না, আর দেরি নয়, যা, উঠে পড়।'"

পিন্টা-মিন্টা জিজ্ঞেস করল, "গাছটা কোথায়, তোমার এখানে অন্য কোনও গাছ তো দেখিনি?"

"প্রথমে আমার ঘরের ওই পিছন দিকটায় রেখেছিলাম, কিন্তু বহু লোকের বহু প্রশ্ন, তোদের কাকিই বলল, 'গাছটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে গাছের ভিড়ে রেখে দিয়ে এসো।' সেই থেকে নেলোর জঙ্গলেই আছে। যখন দরকার হয় তখন চড়ে বসলাম, লোকের যেমন মোটরবাইক, আমারও তেমনি ..."

পুণ্যকাকা হো-হো করে অনেকক্ষণ বুক হালকা করা হাসি হাসতে থাকল।

হঠাৎ পিন্টা বলল, "কাকা, আমি জীবন উচ্ছুগ করব, আমাকে গাছটা দিবে?"

পুণ্যকাকা জড়িয়ে চুমু খায়, দু'ভাইকে দু' বুকে চেপে আদর করতে থাকে।

কিন্তু সকলে মিলে যখন পুণ্যকাকার বাড়ি পৌঁছল তখন সে নেই, গোরু খুলে নিয়ে জঙ্গলে চরাতে বেরিয়ে গেছে। হাতির ভয়েও লোকটা ভয় পায় না, সকলে তাজ্জব হয়ে যায়।

পুন্নাকাকি বলল, "হাতি আসার আগেই গেছে, সকালে।"

"হাতি না আসুক, হাতির ভয় তো ছিল, আমরা কেউ ঘর থেকে বেরোতে পারিনি, আর সে গোরু নিয়ে জঙ্গলে ... দেখো, পুণ্য না কোনও বিপদে পড়ে।"

"আমরা এসেছিলাম পুণ্য যদি কোনও মন্ত্র জানে, যদি হাতিগুলোকে তাড়াতে পারে, গাঁয়ের তিন-তিনটে ছেলে হাতির কবলে পড়েছে, ওদের উদ্ধার করা তো আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। তা বউমা, তুমি কোনও মন্ত্র-টন্ত্র জানো নাকি?"

সাধুচরণ বলল, "হ্যাঁ,হ্যাঁ, গুনিনের বউ যখন তখন জানবে বইকী।"

"বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কোনও মন্ত্রই জানি না।"

"আমাদের ছেলে আটকে পড়েছে বলে আজ তুমি হিংসা করছ গুনিন-বউ, পুণ্যদাও গোরু নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। আমরা কিছু জানি না ভাবছ।"

হিংসার কথা বলতে পুন্নাকাকির ভেতরটা জ্বলে গেল, সে বলে ফেলল, "ঠাকুরপো, তাড়াবার মন্ত্র যদি আমি জানতাম তা হলে আগে খারাপ লোকগুলোকেই গাঁ-ছাড়া করতাম। হাতি ছেলেগুলোকে ঘিরে ধরেছে, রাত-ভিত নয়, দিনের বেলা, আর আপনারা এত লোক সাহস করে যেতে পারছেন না, এসেছেন গুনিন খুঁজতে।"

পুন্নাকাকি বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল, খুব কাঁদতে পারে পুন্নাকাকি, কাঁদতে-কাঁদতে ঘরের ভেতরে চলে যায়, সবার আড়ালে ছেলেগুলোর জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে হাতজোড় করে ঠাকুরকে ডাকতে থাকে পুন্নাকাকি।

যে ছোকরা ব্ল্যাকে কেরোসিন জোগাড় করে দেবে বলেছিল 'যত লাগে আমিই দেব', তাকে টাকা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু সে ফিরে এসে বলল, "অতুল ঘোষ তেল দিতে রাজি হল না।"

"কেন? তেল দিবেনি কেন?"

সে বলল, "যারা-যারা অন্যায় করে, অত্যাচার করে, লোককে ঠকায়, কাঁদায়, হাতির দল নাকি বেছে-বেছে তাদেরই ঘর ভাঙছে, মরাই ভাঙছে, খড়ের গাদা তছনছ করে দিচ্ছে।"

অতুল ঘোষ বলল, "ওরে বাবা, যা করেছি-করেছি আর কোনও পাপ কাজের মধ্যে আমি নেই।"

কিন্তু খবরটা শুনে পাঁচগেড়্যার অনেকেই হাউহাউ করে ওঠে। তা হলে কী হবে, সেও তো ...আরে কম-বেশি প্রত্যেকেই তো ... অন্যায়কারী প্রত্যেকেরই হাত-পা ভয়ে পেটের ভেতরে সেঁদিয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ সাধুচরণ হাতের লাঠিটা নিয়ে লাফ খেয়ে পাক দিয়ে ওঠে। বলল, "কী হাতি দেখাচ্ছ, আমার সঙ্গে দশটা ছোকরা চলুক, আমি যদি হাতির দলকে নিকুড়শনির জঙ্গল পার করে দিয়ে আসতে না পারি তো ..."

কিন্তু হঠাৎ পিন্টা-মিন্টাকে দেখতে পেয়েই কীরকম চুপসে যায় সাধুচরণ, ঘাবড়ে যায়। এত বড় জোয়ান সাহসী লোকটার হাত থেকেও লাঠিটা টুক করে খসে পড়ে।

যখন গোটা গ্রাম জুড়ে এরকম অস্থির অবস্থা চলছে, যখন বিপদগ্রস্ত ছেলেগুলোকে সাহায্য করার জন্য একটিন কেরোসিন তেল কিছুতেই জোগাড় হল না, এমনকী, পুরোহিতের পুজোতেও যখন কোনও কাজ হল না তখনই একটা অঘটন ঘটল। পিন্টা-মিন্টা লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখছিল এবং যখন দেখল এর পর আর কেউ কিছু

করছে না শুধু মশাল তৈরি করার ন্যাকড়া জোগাড় করছে, 'দশটা বোতলও যদি কেরোসিন পেতাম তা হলে হাতির দলকে দেখিয়ে দিতাম' ইত্যাদি, তখন প্রায় সে-সময়ই দেখা গেল দুটো বাচ্চা ছেলে হাতির দলের কাছাকাছি নীলমণি ঘোষের বাদাম বাগানের বড় আলের ওপর দাঁড়িয়ে।

"কে গো ওখানে ? মনুষ্যজন মনে হচ্ছে !"

সকলের কাছে অবিশ্বাস্য লাগে, ওখানে মানুষ যাবে, এত বুকের পাটা ... আবার দেখা যাচ্ছে বড় মানুষ নয়, দুটো একেবারে বাচ্চা ছেলে। দেবশিশু মনে হতে লাগল সকলের। কেউ পা নেংচে দেখছে, কেউ কোঠার চালের ওপরেই উঠে গেছে, কেউ গাছে, কেউ খড়ের গাদায়। তাদের এমন কে বাচ্চা আছে যে, এরকম দুর্জয় হাতিকে পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারে ! না, ওরা দেবশিশু, রাম-লক্ষণ, প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের ভাই, প্রহ্লাদের ভাইয়ের নাম কী যেন, হিরণ্যকশিপুর ছেলে গো ?

গ্রামের কারা হঠাৎ সে-সময় যেন আবিষ্কার করে ফেলল যে, ছেলে দুটো অন্য কেউ না, পিন্টা-মিন্টা, সাধুচরণের বাগাল। ভালভাবে দেখতে-দেখতে সকলে নিশ্চিত হয়, "হ্যাঁ রে, অত ছেঁড়া প্যান্ট তো গাঁয়ের আর কোনও ছেলের নেই।"

"আর ওরকম তেলহীন চুল।"

"আর ওদের মতো শুকনো দুঃখী-মুখ।"

যাদের মা নেই সেইসব বাচ্চাদের এমন-কিছু থাকে না যার জন্য বহু দূর থেকেই ওদের চেনা যায়। রা মানে তা হলে ওই এমন-কিছু। রা নেই বলেই গ্রামের সকলে ওদের চিনে ফেলল। সাধুচরণ বলল, "পিন্টা-মিন্টা ওখানে কেন, আমরা তো কেউ পাঠাইনি !"

পিন্টা বলল, "ভাই রে, চ', আমরাই যাব।"

"কোথা ?"

"চ' না, হাতির কাছে যাব।"

"হাতির কাছে !"

"আমি তো মন্ত্র জানি, ভয় নেই। আয় !"

পিন্টা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "একটু দাঁড়া।" বলে দৌড়ে গিয়ে পুণ্যকাকার মাটির লেপ-দেওয়া মনসা মন্দিরে গড় করে এল। বলল, "চ।" বলেই দৌড়তে লাগল দু'জনে।

সকলে দেখছে নীলমণি ঘোষের বাদাম-বাগানের বড় আলের উঁচুতে দাঁড়িয়েছে পিন্টা, তার পেছনে মিন্টা। এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে চলে এসেছিল, হাতিগুলোর বিচিত্র ও ভয়াবহ ব্যাপার দেখে ঘোর কেটে যায় পিন্টা-মিন্টার। শুঁড়ে করে ধুলো বয়ে-বয়ে এনে ওই ছেলে তিনটেকে লক্ষ্য করে ধুলো ছুঁড়ছে, পাথর ছুঁড়ছে, গাছের ডাল ভেঙে ফাবড়া ছুঁড়ছে, ছুঁড়তে-ছুঁড়তে নাচছে। ছেলে তিনটেকে দেখা যাচ্ছে না পাতায় ঢাকা আছে, গাছের গোড়ায় না গেলে দেখা সম্ভবও নয়। কাজু গাছ খুব একটা শক্ত-সবল গাছ নয়, সব হাতি মিলে বেড় দিয়ে হ্যাঁচকা টান মারতে থাকলে হয়তো গাছটাও উপড়ে যেতে পারে।

হঠাৎ বড় হাতিটা পিন্টা-মিন্টাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। গোটা দলটাও সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পিন্টা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল, নেমে পড়ল আলের নীচে, এগিয়ে গেল আরও পাঁচ-পা। পিন্টার দেখাদেখি

আকাশে ওড়ার কথা □ বাইশ — ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৪ : প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের জার্মান বিমান

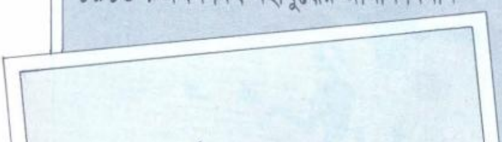

আইনডেকার স্কাউট

আইনডেকার স্কাউট

ফকার মনোপ্লেন নামে প্রসিদ্ধ এই বিমানটিই ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে আকাশযুদ্ধের সূচনা করে। নির্মাতা অ্যান্টন ফকার বিমানটিতে একটি বিশেষ যন্ত্র লাগিয়েছিলেন যাতে এর প্রপেলার ঘোরার ফাঁকে ফাঁকে মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করা যেত। যদিও মাত্র ২০০টি আইনডেকার বিমান তৈরি হয়েছিল, ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে ১৯১৫-১৬ সাল অবধি এটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী বিমান।

এল ভি জি বম্বার

যুদ্ধ শুরুর সময়ে জার্মান সৈন্যবাহিনীতে কয়েকটি এই বিমান শত্রুপক্ষের সৈন্যের অবস্থান লক্ষ করা ও গোলাবর্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছিল। আত্মরক্ষায় কোনও অস্ত্র না থাকায় এবং অনেক বিমান ঘায়েল হওয়ায় এগুলিতে শক্তিশালী মেশিনগান যোগ করা হয় ও বোমাবর্ষণে এগুলি খুব কাজে আসে।

আইনডেকার স্কাউট বিমানের বিশদ বিবরণ

নির্মাতা : ফকার
লম্বায় : ২৪ ফিট (৭·৩ মিঃ)
ডানার আয়তন : ৩১·২৫ ফিট (৯·৫ মিঃ)
যাত্রী বা বৈমানিক : একজন বৈমানিক
অস্ত্রসম্ভার : একটি বা দুটি মেশিনগান, শুধু সামনের দিকে গুলিবর্ষণে সক্ষম
গতিবেগ : ঘণ্টায় ৮৭ মাইল (১৪০ কিমি)
সিলিং : ১২০০০ফিট (৩৬৫০মিঃ)
একটানা ওড়ার ক্ষমতা : দেড় ঘণ্টা
এঞ্জিন : একটি ১০০ অশ্বশক্তির ওবেরুসেল ইউ-১

এল ভি জি বম্বার বিমানের বিশদ বিবরণ :

নির্মাতা : লুফত্ ফেহেরস্ গেজেলশাফট, য়োহানিস্তাল
লম্বায় : ২৬·৫ ফিট (৮·০৭ মিঃ)
ডানার আয়তন : ৪২·৭৫ ফিট (১৩·০২ মিঃ)
যাত্রী বা বৈমানিক : একজন বৈমানিক ও একজন নিরীক্ষণকারী
অস্ত্রসম্ভার : একটি মেশিনগান ও একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য হালকা কামান
গতিবেগ : ঘণ্টায় ১০২ মাইল (১৬৪ কিমি)
সিলিং : ১৬৫০০ ফিট (৫০০০ মিঃ)
একটানা ওড়ার ক্ষমতা : সাড়ে তিন ঘণ্টা
এঞ্জিন : একটি ২০০ অশ্বশক্তি বেঞ্জ বি জেড-৪

মিন্টাও টানা হয়ে এগিয়ে গেল। ওদিকে বড় হাতিটাও এগিয়ে আসছে, সেও তার পাঁচ-পা এগোল, এগিয়ে দাঁড়াল, তার পেছনে তার পুরো দল। তারাও পাঁচ-পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এরকম ঠিক পাঁচ-পা করে এগোতে থাকে দু'দিকে দু'পক্ষ।

পিন্টা-মিন্টার ভেতরের কথা কেউ জানে না, কিন্তু যে-যেখান থেকে তাদের দেখছে তারা সেখানেও নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। যে গাছের ডাল ধরে ছিল, তার মনে হচ্ছে গাছের ডালছাড়া হয়ে যাচ্ছে, পা খসে যাচ্ছে চালের টং থেকে, যে-যে বউ-ঝি'রা অহল মাঝির কাঁথড়ার ওপরে উঠে দেখছিল তারা ভূমিকম্পে কাঁথ পড়ে যাবার মতন সবাই একসঙ্গে বুক চেপে চেঁচিয়ে ওঠে, "ওঃ, ভগবান!"

পিন্টা আর এগোল না, ওইখানেই হাঁটু মুড়ে মাথা ঠুকে প্রণাম করে। তার দেখাদেখি মিন্টাও মাথা নোওয়ায়।

তারা দু'জনেই প্রায় পাথর হয়ে গিয়েছিল, মাথা তোলার সাহসই হয়নি।

এরকম কতক্ষণ কেটেছিল জানে না, হঠাৎ একসময় মনে হল তাদের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে কে যেন আদর করছে, মায়ের আদরের মতো। এই আদরই সাহস জোগাল, পিন্টা-মিন্টা চোখ খুলে দেখল, বড় হাতিটা তাদের গায়ে-মাথায় শুঁড় বোলাচ্ছে।

কিন্তু এ-সময়ই গ্রামে শঙ্খধ্বনি বেজে ওঠে। হরিবোল-হরিবোল! শাঁখের শব্দে হাতির দল বিচলিত হয়, বড় হাতি শুঁড় তুলে একটা বিকট শব্দ করল, দলের সকলকে কী যেন নির্দেশ দিল, তারপর গোটা দল বড় হাতির পেছনে-পেছনে চলতে শুরু করল গভীর জঙ্গলের দিকে।

হাতির দল চলে যাওয়ার পর গ্রাম ভেঙে লোকজন দৌড়ে আসে নীলমণি ঘোষের বাদাম-বাগানে। সকলে তিনজন সোনার চাঁদ ছেলেকে গাছ থেকে নামানো ও তাদের পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পিন্টা-মিন্টা আর ওই অত ভিড়ের মধ্যে গেল না। তারা হঠাৎ দূরে একা-দাঁড়ানো কান্নারত পুন্নাকাকিকে দেখতে পায়, ওরা তার দিকেই দৌড়তে থাকল।

॥ ২ ॥

কিন্তু এর পর থেকেই হাতি তাড়ানোর সমস্ত দায় এসে পড়েছে পিন্টা-মিন্টার ওপর। হাতি আসছে কথাটা কীভাবে মুখে-মুখে চাউর হয়ে যেত, পাশের গ্রামের উৎপীড়নের খবর প্রায় আছড়ে পড়ত বেতার তরঙ্গের মতো, আর সঙ্গে সঙ্গে পিন্টা-মিন্টাকে বেরিয়ে পড়তে হত হাতি সামলাতে।

ইতিমধ্যে হাতির দল দুবার এসেছে, দু'বারই সামলেছে। বেরিয়ে দ্যাখে, হাতির দল সার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের গ্রামের চৌমাথানিতে। সকলের আগে বড় হাতি।

পিন্টা পা-পা করে এগোয় হাতজোড় করে, তার পেছনে মিন্টা। বড় হাতির কাছে গিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করল, সেও তেমনি শুঁড় দিয়ে আদর করল। পিন্টা-মিন্টা এক-এক করে সকলের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, শুঁড়ে হাত বুলিয়ে চুমু খায়। তারপর পিন্টা-মিন্টা কী বলল, যেমনই এসেছিল তেমনিই দল বেঁধে ফিরে গেল জঙ্গলের দিকে।

কিন্তু এর তো অবসান চাই, কতদিন আর ভয়ে-ভয়ে, কত আর পিন্টা-মিন্টাকে দিয়ে ... হাতির জন্যই তো কতদিন হয়ে গেল ঠাকমা-বুড়ি দুটো প্রাণ খুলে গালাগাল দিতে পারছে না, সাধুচরণ দুটো চড়-থাপ্পড় মারতে পারছে না, সকলের ভয় যদি হাতিকে বলে দেয়।

পাশাপাশি সব ক'টা গ্রামই প্রায় হাতির অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হতে বসেছে, পাঁচগেড়্যার লোকেরাও চায় হাতির ভয় থেকে মুক্তি। ফলে

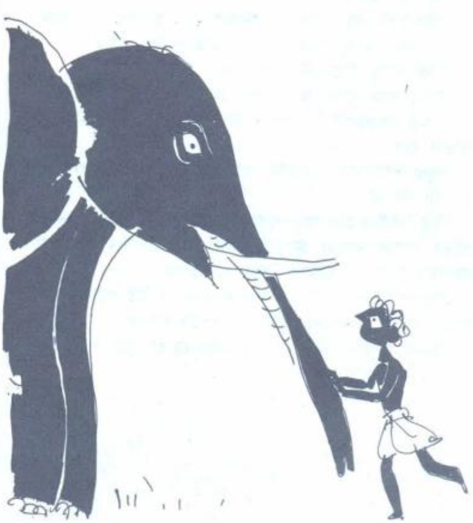

একদিন আলোচনা করে সরকারি অফিসে সমবেত দরখাস্ত করল আট গ্রামের লোক।

সংশ্লিষ্ট সরকারি লোকেরাও বেশ ফ্যাসাদে পড়ে যায়, কী করা যাবে, হাতি মারা নিষেধ। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় পোষা হাতি পাঠানো হবে, সেই ভুলিয়ে-ভালিয়ে দলটাকে নিয়ে এসে একটা খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেবে। অনেক টাকা খরচ করে একটা খোঁয়াড়ও তৈরি করা হল।

নির্দিষ্ট দিনে পোষা হাতি এসেছে, অনেক ঘোরাঘুরির পর দেখা পেয়েছে দলের। সে মানুষের কাছ থেকে যা শিখেছে তা অভিনয় করে যতটা বলার বলল। কিন্তু বড় হাতি ছিল পোষা হাতির চেয়েও চালাক। সে প্রথমেই বুঝে গেল, যে একা থাকে তার মধ্যে এত মনস্তাপ থাকে যে, তার শরীরে অমন তেল চুঁইয়ে পড়ে না। ফলে পোষা হাতি যখনই নেতৃত্ব দিয়ে দলটাকে নিয়ে যেতে চাইল তখনই বাধা দিল বড় হাতি। তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, তুমি যদি আমাদের সঙ্গ চাও তা হলে সকলের পেছনে যাও। শুনে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল পোষা হাতি। পশু সাম্রাজ্যে বরাবর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। পোষা হাতি ফাঁক বুঝে টুক করে একটা বড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং খানিক পরে পেছন দিক দিয়ে চোঁ-চোঁ পালিয়ে আসে।

এই পোষা হাতি ছাড়ার পর থেকে কিন্তু হাতির অত্যাচার আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

গ্রামের লোকেরা বলল— পোষা হাতি নয়, হাতির দলটাকে ধরিয়ে দিতে পারে একমাত্র পিন্টা-মিন্টা।

আট-দশ গ্রামের লোক একসঙ্গে বসে মিটিং করল, পিন্টা-মিন্টাকে ডাকা হল, সবাই মিলে চাপ দিল ওদের ওপর। "যে-কোনও উপায়ে এ-কাজটা তোদের করে দিতেই হবে, হাতির দলটাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে একটিবার ওই খোঁয়াড়ে পুরে দিতে হবে। ব্যস।"

রাখাল পালের বিশাল দরদালানে মিটিং চলছে, হাতি ধরার মিটিং।

"কী রে, বল ?"

পিন্টা-মিন্টা কিছু বলছে না, কেবল গালে হাত দিয়ে বসে আছে।

কে যেন বলল, "ওরা বোধ হয় টাকা-পয়সা চাইছে।"

"ঠিক আছে টাকা দেব, কত টাকা নিবি বল ?"

টাকার কথা শুনে অস্বাভাবিক চমকে ওঠে পিন্টা-মিন্টা।

গ্রামের লোকেরাই ঠিক করল, গ্রামপিছু একশো টাকা করে তুলে দেওয়া হবে।

তবুও পিন্টা-মিন্টা বসে রইল গালে হাত দিয়ে, কোনও কথা বলল না, হ্যাঁ কি না ...

কিন্তু টাকাটার প্রতি সাধুচরণের ভীষণ লোভ হয়, লোভ কেন তার বাড়ির বাগাল, বাগাল অবস্থায় যেখানে যা উপার্জন করবে সব হক-পাওনা তার। আটশো টাকা এ-বাজারে ...

সাধুচরণই বলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাবে না কেন, আমিই পাঠাব, আমার বাড়ির বাগাল, আমাদের এত গ্রামের উপকার হবে ..."

মনে-মনে বলল, 'ঠিক আছে দুজনকে না হয় দুটো প্যান্ট কিনে

দেব, বড্ড ছিঁড়ে গেছে প্যান্ট দুটো।'

"তবে ...."

সাধুচরণ বলল, "তবে ওদের হাতে নগদ টাকা না দিলে ওরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।"

শুনে আরও আঁতকে উঠল পিন্টা-মিন্টা।

সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল দু'দিনের মধ্যেই সমস্ত টাকা তুলে ওদের দিয়ে দেওয়া হবে।

সকলে বলল, "হাতির দলটাকে কিন্তু খোঁয়াড়ের ভেতরে নিয়ে যাওয়া চাই !"

"হ্যাঁ, যে-কোনও উপায়ে, যে-কোনও গতিকে।"

"কী রে, পারবি তো ?"

এবারও মুখে কিছু বলল না, ভেতরে-ভেতরে আরও আঁতকে ওঠে পিন্টা-মিন্টা।

দেখতে-দেখতে ওই দু'দিনও কেটে যায়, টাকা আদায় হয়ে গেছে, আগামীকাল দিয়ে যাওয়ার দিন।

সাধুচরণের ছেলেরা বায়না ধরেছে একটা সাইকেল কিনবে। ওইদিন সন্ধেবেলা পিন্টা মিন্টাকে ডেকে নিয়ে আসে পুণ্যকাকার বাড়ি।

পুণ্যকাকা জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কাল তো টাকা দিবার দিন ?"

পিন্টা বলল, "হ্যাঁ"।

"তোর বাবাকে চিঠি পাঠা, আসতে বল, এসে টাকাটা নিয়ে যাবে। তোরা কোথা রাখবি অত টাকা-পয়সা।"

পিন্টা এ-সম্পর্কে কিছু বলল না, সে তাড়াতাড়ি বলল, "কাকা, আমাকে গাছ-উড়োনো বিদ্যেটা শিখিয়ে দিবে যে ?"

"হ্যাঁ,হ্যাঁ, সে দিলে হবে, এখন ..."

কিন্তু ভীষণ জোর দিয়ে বলল পিন্টা, "না, আমাকে আজকেই শিখিয়ে দিতে হবে, আজ নয় কাল করে অনেক ঘুরিয়েছ, আর ঘুরবনি !"

"কেন, তুমি তো বলেছ মোটে ছ' লাইনের মন্ত্র। কতক্ষণ যাবে !"

এমন জোর কখনও করেনি পিন্টা, হঠাৎ ...যাকগে, ছেলেটা ছাড়ছে না যখন, তখন বানিয়ে-বানিয়ে ছ'টা লাইন ...অং-বং করে বলেই দিল পুণ্যকাকা।

কিন্তু হুবহু মুখস্থ না-হওয়া পর্যন্ত পিন্টা ছাড়ছে না, কিছুতেই ছাড়ছে না। এদিকে নিজেরই যে ভুল হয়ে যাচ্ছে পুণ্যকাকার, ও তো বানানো মন্ত্র, সাপের এক লাইন তো বিছের এক লাইন ....যত বলে, "ওরে মন্ত্র কিছু নয় গাছটাই আসল, একটাই তো গাছ, ওই গাছটা খুঁজে না পেলে ..."

পিন্টা বলে, "ও ঠিক খুঁজে পেয়ে যাব, তুমি তো বলেছ কোথা রেখেছ, সেখানে ওরকম গাছ তো আর নেই।"

"না, তা নেই।"

আজ আসার সময় হঠাৎ পিন্টা পুণ্যকাকাকে প্রণাম করল, দেখাদেখি মিন্টাও করে। পুন্নাকাকিকেও প্রণাম করল দু' ভাই।

পুণ্যকাকা হেসে বলল, "কী রে, গুরুদক্ষিণা নাকি !"

কাকি দুজনকে জড়িয়ে চুমু খায়, আশীর্বাদ করে, "সুখে থাক, একশো বছর পরমায়ু হোক।"

পুন্নাকাকির কাঁদালেই এখন আঞ্জনি, প্রজাপতি, ব্যাঙ-কেঁচোর বাসা। বেশির ভাগ সময় কাকিই ওদের যত্ন করে, দেখাশোনা করে।

পিন্টা ডানাভাঙা প্রজাপতিটাকে তুলে নিয়ে মিন্টার হাতে দেয়, "নে, একে ধর।"

সে তুলে নেয় লেজভাঙা আঞ্জনিকে।

পিন্টা হঠাৎ বলল, "আর ওদিকে নয়, এদিকে আয়।"

বলে সাধুচরণের বাড়ির দিকে না গিয়ে জঙ্গলের দিকের রাস্তায় মোড় ঘোরে।

মিন্টা জিজ্ঞেস করে, "রাতের বেলা জঙ্গলের দিকে কোথা যাবি ?"

"গাছ-উড়ানো মন্ত্র শিখলাম না, গাছ উড়িয়ে নিয়ে বাবার কাছেই চলে যাব, হাতি ধরিয়ে দিতে পারবনি, কিছুতেই পারবনি !"

জঙ্গলে ঢুকে-না-ঢুকেই হঠাৎ হু-হু করে কেঁদে উঠল পিন্টা, দাদার কান্না দেখে মিন্টাও কাঁদে।

হাঁটছে, অন্ধকারে জঙ্গলের ভেতরে রাস্তা ঠিক করতে পারছে না, তবুও হাঁটছে।

"দাদা রে, আমরা সেই গাছটা চিনতে পারব তো ?"

"সে তো আলাদা গাছ, তার ডাল-পাতা সব আলাদা, চিনতে পারব না ! আয়।"

মিন্টার হাতে প্রজাপতি খড়খড় করছে, পিন্টার হাতে আঞ্জনি সরসর করছে, তারা এখন দু'জন নয়, চারজন। চারজনে মিলে খুঁজবে, তবু পাবে না।

(সমাপ্ত)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

তা হলে তৃতীয় কাজটিও তুমি নির্বিঘ্নে হাসিল করলে ! খাসা ! এবার শোনো, ঠিক করেছি এই খুচরো কাজ-গুলি তখন নিয়মিত ব্যবসায় দাঁড় করাব । সব-কিছু বৈধ । বিজ্ঞাপন দেব, "ছিনতাই চাই ? বিশেষজ্ঞ সংস্থা 'অপহরণ নিগম'-কে ডাকুন । দ্রুত, সতর্ক কাজ । কেউ টের পাবে না ।"
একটু অপেক্ষা করো । আমাদের সংস্থার নিয়মকানুন নিয়ে আসছি···
উহ্ !
কী ব্যাপার ?
মনে হল ও পড়ে গেছে···
?
?
ওর বোধ হয় স্ট্রোক হয়েছে···জলদি একটু জল নিয়ে এসো···
উউফ্ !
?
?
বাগ্‌সি ! এই বাগ্‌সি ! ওঠো !
ঠকক
চমৎকার !···উফ্ ! এর ভেতরে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম···
ওরা সবাই বেহুঁশ ! এবার কুট্টুসের খোঁজে যেতেই হবে···

আমেরিকায় টিনটিন

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস· এ·

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটম্যান
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক কয়েদির জরুরি ডাকে ব্যাটম্যান আর রবিন জেলখানায় এসেছে···
আমি নির্দোষ ! যেভাবেই হোক আমাকে বাঁচাও !
আমি নিরুপায়, বাওয়ার ! বিচারে তোমার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে !
যে-অপরাধ করিনি তার জন্য মরতে হবে ! আশা ছিল তুমি বিশ্বাস করবে··· আমার বোকামি !
শুনলে ক্ষতি নেই··· যদিও স্বীকারোক্তি দেবে বলে আমাকে ডেকে এনেছ !
ধন্যবাদ ! আমি দুর্লভ গ্রন্থের কারবারি ডোরিয়ান অ্যান্ড স্টিল-এর কর্মী··· সেই রাতে···
"সেই রাতে বই-এর হিসেব মেলাতে আমি দোকানে ফিরে দরজা খুলে শুনলাম···"
উহ্··· আহ্···
গুলির শব্দ ! অফিস ঘর থেকে !
গুড়ুম
"হঠাৎ দরজা খুলে গেল ! একটা লোক, তার মুখ দেখতে পাইনি, আমাকে ফেলে দিল···"
আহ্ !
"আমি পড়ে গেলাম ! আমার মাথা ঘুরছিল ! ততক্ষণে লোকটা পালিয়েছে আর মিঃ ডোরিয়ান···"
মৃত··· খুন হয়েছেন !
"আঘাতে আর ভয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন আমি পিস্তলটা তুলে নিলাম···আর তখন"
খুন !
পিস্তল ফেলে দাও, খুনি !
ওরা আমাকে ধরল ! সব প্রমাণই আমার বিরুদ্ধে ! কিন্তু আমি খুন··· করিনি··· খুন করেছে সেই লোকটা !
হ্যাঁ, পুলিশ লোকটাকে পালাতে দেখেছিল ! বাইরে গাড়ি ছিল, সেই গাড়িতে ও পালিয়ে যায় !
পুলিশের ধারণা ও আমার সহযোগী, লুঠের জিনিস নিয়ে ও পালিয়েছে··· প্রথম সংস্করণের দুর্লভ সব দামি বই ! আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে ?
তুমি কাউকে সন্দেহ কর ?
হ্যাঁ ! একটা লোককে ! সে দোকানে ঢুকতে পারত আর তার টাকার খুব দরকার ছিল···লোকটা ডোরিয়ানের অংশীদার···
···ফ্রেড স্টিল ! শেয়ারবাজারে লোকসান দিয়ে ডোরিয়ানের সঙ্গে ও ঝগড়া করত ! দামি বইগুলি চুরি করে ও বিক্রি করতে পারে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

অ্যাডভেঞ্চার

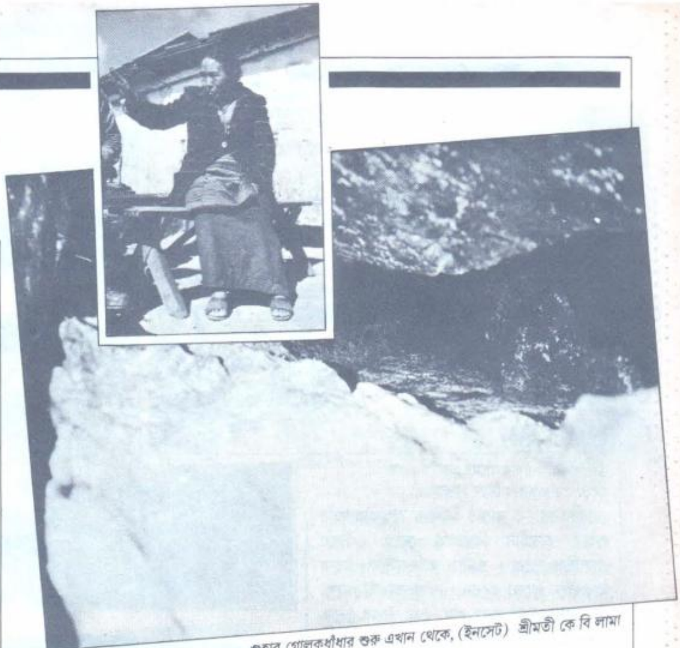

গুহার গোলকধাঁধার শুরু এখান থেকে, (ইনসেট) শ্রীমতী কে বি লামা

কালিপোখরির অন্ধকার গুহায়

অন্ধকারে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় পথ ভুল হয়ে যেতে পারে। অজানা আতঙ্ক। তারপর? **অরিন্দম দেবনাথের** প্রতিবেদন

পূর্ব হিমালয়ের কোলে, ১০২৫০ ফুট উঁচুতে ভারত-নেপাল সীমান্তের একটি গ্রাম। কয়েকঘর নেপালি ও তিব্বতির বাস। সারা বছরে মাস চারেক বরফে ঢাকা থাকে গ্রামটি। বাকি সময় সবুজ গাছ ও রংবেরঙের ফুলের হাসিতে ঝলমল করে ওঠে, আর দেশ-বিদেশের প্রকৃতিপ্রেমী ও পর্বতারোহীদের ভিড় শুরু হয়ে যায় গ্রামটিতে।

একটি ছোট জলাশয় আছে গ্রামটির প্রবেশদ্বারে। জলের রং কুচকুচে কালো। নেপালি ভাষায় কালোকে বলে 'কালি' আর জলাশয় বা পুকুরকে বলে 'পোখরি'। ফলে গ্রামটির নাম হয়ে গেছে কালিপোখরি। শীতকালে এইসব অঞ্চলে কয়েক মিটার পুরু হয়ে বরফ জমে যায়, কিন্তু কালিপোখরির জল অদ্ভুতভাবে একইরকম থাকে, অর্থাৎ বরফ হয়ে যায় না। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে খুব পবিত্র এই জলাশয়।

গতবছর অক্টোবরের শেষের দিকে পাঁচ বন্ধুর সঙ্গে পুর্ব-হিমালয়ে ট্রেকিংয়ে বেরিয়ে উপস্থিত হলাম কালিপোখরি গ্রামে। সেখানে আলাপ হল গ্রামের এক বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে। ৭১ বছর বয়সের কে বি লামা তাঁর ৬৮ বছর বয়স্কা স্ত্রী। দু'জনে মিলে ওখানেই একটি পান্থশালা চালান। নেপালি-তিব্বতি-হিন্দি মেশানো ভাষা আমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকলেও তার সারমর্ম বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

হঠাৎই আমার মনে পড়ল বহুদিন আগে কলকাতায় আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মুখে শোনা, কালিপোখরি গ্রামেই তার এক অভিজ্ঞতার কাহিনী। একটি অদ্ভুত ধরনের গুহার কথা সে বলেছিল। স্থানীয় একটি ছেলে তাকে নিয়ে গিয়েছিল একটি গুহায়। দিনের বেলায় মশাল জ্বেলে গুহায় ঢুকেছিল বন্ধুটি সেই ছেলেটির সঙ্গে।

অভিযানের অন্যতম সঙ্গী পাহাড়ি যুবক, নাম: প্রেম

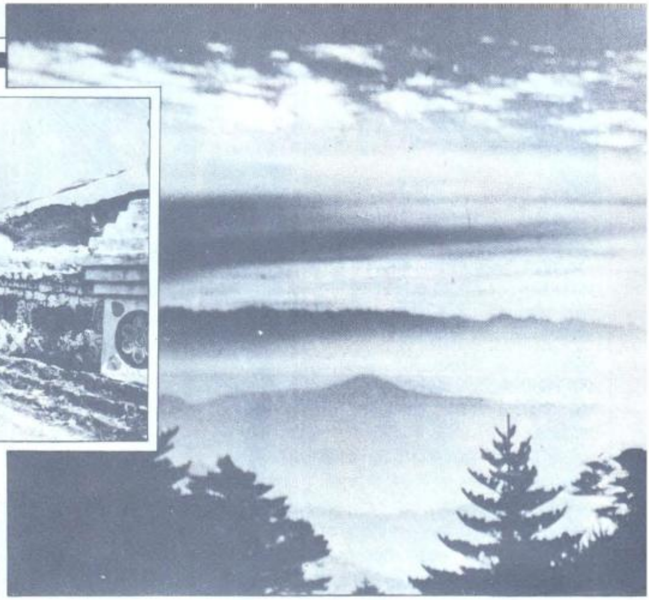

উপরে, কালিপোখরি গ্রামের একাংশ। পাশে, বনভূমিতে অন্ধকার নেমে আসছে

ঢোকার খানিক বাদেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর গুহার অন্তহীন বিশালত্ব দেখে বেরিয়ে এসেছিল তারা। স্থানীয় অধিবাসীরা গুহার মাঝখানে পুজো করেন। কিন্তু কার উদ্দেশ্যে বা কেন পুজো করা হয়, তার উত্তর দিতে পারেনি সেই ছেলেটি।

কে বি লামার স্ত্রীর কাছে গুহাটির প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি চমকে উঠলেন, আমরা বাইরের লোক হয়ে ওই গুহার কথা জানলাম কী করে!

বললাম যে, "আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি। আমরা ওই গুহা দেখতে চাই, আপনি সাহায্য করবেন কি?"

আমার অনুরোধ শুনে গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন বৃদ্ধা। তারপর আমাদের দলের পথপ্রদর্শক ও মালবাহক প্রেমকে ডেকে, গুহার অবস্থান বুঝিয়ে, আমাদের নিয়ে যেতে বললেন। আর আমাদের ডেকে বললেন, "গুহার ভেতরে এত অন্ধকার যে, মশাল না জ্বেলে যাওয়া যায় না। তোমরা টর্চ নিয়ে যাও আর গুহার মুখে প্রণাম করে পবিত্র মন নিয়ে ভেতরে ঢুকবে, নতুবা বিপদে পড়বে।"

কে বি লামার পান্থশালা থেকে গুহাটির দূরত্ব তিনশো মিটারের মতো। ঝোপঝাড় ও আগাছায় ঢাকা গুহামুখ। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। একটি ফাটলের মুখে বড় একটি পাথরের চাঁই পড়ে আছে, তাতে পুরু হয়ে জমে আছে শ্যাওলা। আর পাথরের চাঙড়ের ঠিক পাশেই একজন মানুষ ঢুকে যেতে পারে, এরকম একটি সরু গর্ত।

গুহায় ঢুকব কি ঢুকব না, চিন্তা করার আগেই দেখি প্রেম তার শরীরের নিম্নাংশ সঙ্কীর্ণ গর্তটির মধ্যে নামিয়ে দিয়েছে। কিছু বলার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল প্রেম। একটু

মুখের ওপর সপাটে কোনও উড়ন্ত প্রাণীর পাখার ঝাপটা খেলাম। ওটা বাদুড়জাতীয় কোনও প্রাণী কি না, বুঝতে পারিনি! আমাদের দুজনের চিৎকারে সুড়ঙ্গের মধ্যে যে অনুরণন সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে ঝুরঝুর করে খসে পড়ল বেশ কিছু পাথরের টুকরো।

বাদে নীচ থেকে ভেসে এল প্রেমের গলা, "চলে এসো, কোনও বিপদ নেই!" প্রথমে ফোকরের ভিতরে পা দুটো গলিয়ে দিলাম। তারপরে কোমর পর্যন্ত নামিয়েও পায়ের তলায় কোনও তলই পেলাম না। কপালে যা আছে তাই হবে, গোছের চিন্তা করে বাকি শরীরটা ঝুলিয়ে পাথরের ধার থেকে হাত সরিয়ে নিতেই পায়ের নীচে নুড়ি-পাথর-মাটি মেশা জমির ছোঁয়া পেলাম।

ধাতস্থ হওয়ার পর চারধারে তাকালাম। ঘন অন্ধকারের মধ্যে শুধু মাথার ওপরের ফাটলটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম এক চিলতে সরু রোদ-ঝলমলে আকাশ। প্রেমের সাড়া পেতেই হাতের টর্চটার কথা মনে পড়ল। বোতাম টিপতেই টর্চ জ্বলে উঠল। কিন্তু গুহার ঘন অন্ধকার ও শ্যাওলা-ধরা কালচে দেওয়ালে সে আলো খুব একটা উজ্জ্বল মনে হল না। গুহার দেওয়ালের উপরের দিকে কিছু বাদুড় ও চামচিকে জাতীয় প্রাণী ঝুলে আছে দেখতে পেলাম।

সঙ্কেত করতেই, ওপর থেকে একই ভাবে গুহার মধ্যে নেমে এল আমার আরও দুই সঙ্গী—অলোক ও রাণু। গুহার বাইরে, ওপরে আমাদের অপেক্ষায় রইল মানিক, শুভাশিস ও উত্তরা।

চারজনের হাতে ঝলসে উঠল চারটে টর্চ। খানিক ফাটল ধরল গুহার জমাট অন্ধকারে। গুহার ভেতরটা প্রশস্ত। একে অপরকে ধরে পাথরে ঠোক্কর খেতে-খেতে টর্চের আলোয় বরফ-ঠান্ডা শ্যাওলা-ধরা পাথরের দেওয়াল ঘেঁষে ২০ ফুটের মতো এগনোর পর আর সামনে এগনোর উপায় রইল না।

প্রথমে মনে হল গুহাটা ওখানেই শেষ। পরে ভাল করে চারধারে আলো ফেলতে দেখা গেল, সামনের দিকে পাথরের দেওয়াল ফুঁড়ে তিনটে সুড়ঙ্গ তিন দিকে চলে গেছে। তার একটার মুখে পাথরের উপর সিঁদুর জাতীয় কিছুর প্রলেপ রয়েছে। রয়েছে পুড়ে যাওয়া ধূপকাঠির অবশিষ্টাংশ। বুঝলাম স্থানীয় অধিবাসীরা গুহার এই জায়গাতে এসেই পুজো করেন।

ভাল করে চারধার দেখে বুঝতে পারলাম

কালিপোখরির পরিচিত দৃশ্য

যে, এই জায়গা থেকে এগিয়ে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি কখনও। ফিরে যাওয়ার চাইতে সুড়ঙ্গ তিনটির শেষ কোথায়—তা দেখার তাগিদই বেশি অনুভব করছিলাম। কিন্তু কীভাবে ? এগুলো এত সরু যে বুকে হেঁটে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। ভাল করে আলো ফেলে দেখে মনে হল, তিনটি সুড়ঙ্গের মধ্যে দুটো একটু এগিয়েই বন্ধ হয়ে গেছে পাথর পড়ে। এসব অঞ্চলে প্রায়ই হালকা ভূকম্পন হয়। শুধুমাত্র যে গুহাটার প্রবেশমুখে পুজো হয়, সেটা ক্রমশ ঢালু হয়ে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে।

ওই সুড়ঙ্গের ভিতরে আমি ঢুকব। বাকি তিনজনকে সিদ্ধান্তের কথা জানাতেই লাফিয়ে উঠল পাহাড়ি যুবক প্রেম, "ম্যায় ভি যাউঙ্গা আপকা সাথ।" অনুমতির অপেক্ষা না করেই, এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে ধারালো কুকরি নিয়ে শুয়ে পড়ল সুড়ঙ্গ পথের মুখে। তারপর বুকে হেঁটে ঢুকে গেল ভিতরে। তার পিছন-পিছন আমিও। বাইরে রইল অলোক ও রাণু।

সুড়ঙ্গটি এত সরু, পিচ্ছিল ও ঢালু যে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। এবড়োখেবড়ো, ঠাণ্ডা, পাথুরে শক্ত মেঝেতে বুকে হেঁটে এগনো যে কতটা কষ্টসাধ্য তা বলে বোঝানো যাবে না। গাঢ় অন্ধকারে টর্চের জোরালো রশ্মিও জোনাকি পোকার মতো মিটমিট করছিল। সুড়ঙ্গের পাথুরে দেওয়ালের ফাটল বেয়ে টপটপ করে জল

বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। একটি ফাটলের মুখে বড় একটি পাথরের চাঁই পড়ে আছে, তাতে পুরু হয়ে জমে আছে শ্যাওলা। আর পাথরের চাঙড়ের ঠিক পাশেই একজন মানুষ ঢুকে যেতে পারে, এরকম একটা সরু গর্ত।

ঝরছে। মোটা জিনসের প্যান্ট, পুরু উলের সোয়েটার থাকা সত্ত্বেও হাঁটু দুটো ও কনুই ছড়ে গেছে বুঝতে পারছিলাম। কোমর টনটন করছে। তবুও উঠে বসার কোনও উপায় নেই। মাথা একটু তুললেই ধাক্কা লাগছিল সুড়ঙ্গের পাথুরে ছাদে।

কতটুকু পথ এগিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ সামনে থেকে প্রেমের গলা পেলাম, "এই সুড়ঙ্গ পথটাও সামনে কয়েকটা মুখে বিভক্ত হয়ে গেছে। এখন কী করা যায় ?"

আমি তৎক্ষণাৎ ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। কেননা, ওই অন্ধকারে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় পথ ভুল হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া সুড়ঙ্গের ভিতরে কী থাকতে পারে, তার কোনও ধারণাই আমাদের নেই।

ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি, আচমকাই প্রেমের ভয়ার্ত চিৎকারে আর মুহূর্তের অসতর্কতায়, দাঁতে কামড়ে থাকা আমার টর্চটা ছিটকে পড়ে গেল। অজানা আতঙ্কে আমার মুখ থেকেও বেরিয়ে এল আর্ত চিৎকার। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মুখের ওপর সপাটে কোনও উড়ন্ত প্রাণীর পাখার ঝাপটা খেলাম। ওটা বাদুড়জাতীয় কোনও প্রাণী কি না, বুঝতে পারিনি ! আমাদের দু'জনের চিৎকারে সুড়ঙ্গের মধ্যে যে অনুরণন সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে ঝুরঝুর করে খসে পড়ল বেশ কিছু পাথরের টুকরো। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং ভয়ে, বুকের মধ্যে থেকে হৃৎপিণ্ডটা ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল ! শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিম স্রোত ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

সম্বিৎ ফিরল সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা অলোক ও রাণুর উৎকণ্ঠাভরা চিৎকারের ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসাতে। হাতড়ে-হাতড়ে টর্চটা খুঁজে পেলাম সুড়ঙ্গের মেঝে থেকে। বোতাম টিপতেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর রেখা ফুটে উঠল। প্রেমকে ডেকে নিয়ে ফিরতে শুরু করলাম সেদিকে, যেখানে বাকি সঙ্গীরা আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে, রয়েছে খোলা আকাশ, সবুজ গাছপালা আর মুক্ত বাতাস। পিছনে পড়ে রইল সুড়ঙ্গের পাথুরে মেঝেতে জল পড়ার শব্দ, মাথা নিচু করে ঝোলা চামচিকের দল, সিঁদুর মাখা পাথর। দুই কৌতূহলীর সাহস এবং সঙ্কল্প—আবার আসব, পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে, সুড়ঙ্গের শেষ কোথায় জানতেই হবে।

ফোটো : লেখক ও রাণু ঘোষ

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গণপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

শুভঙ্করের মন ধলভূমগড়ে পড়ে থাকলেও ঘাটশিলার পরিবেশ কিন্তু ওকে মুগ্ধ করল। চারদিকে পাহাড়ের পাঁচিল, তারই মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে সোনার নদী সুবর্ণরেখা। থানার সামনে একটি দিঘির ধারে খোলা মাঠে আদিবাসীদের হাট বসেছে। আর-এক পাশে চূড়াবিহীন ঘরের মতো মন্দিরে রয়েছেন রঙ্কিণী। এই রঙ্কিণীদেবীর গল্প ওর বাবার মুখে শুনেছে অনেকবার। তাই এই অপূর্ব যোগাযোগে সেই বহুশ্রুত মন্দিরের পাশেই যে থানার মধ্যে ওকে একদিন বসে থাকতে হবে তা ও স্বপ্নেও ভাবেনি।

দারোগাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, "এখনও কুড়ি মিনিট সময় আছে। অবশ্য যদি ঠিক সময়েই গাড়ি আসে। লেট করলে আরও অপেক্ষা করতে হবে।" বলেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, "হ্যালো, ঘাটশিলা স্টেশন! থানা থেকে বলছি···।"

"হ্যাল্লো··· হ্যাল্লো···।"

"ডাউন ইস্পাত ট্রেনের ব্যাপারে একটু জানতে চাই।··· কী বললেন? আধ ঘণ্টা লেট? ··· হ্যাঁ। আচ্ছা। ··· না না, আমি নয়, মানে একজন ডি· এস· পি'র ছেলেকে কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে। ··· আচ্ছা-আচ্ছা, পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে টেবিলের ওপর রাখা বেল বাজালেন।

একজন পিওন ঘরে ঢুকল।

"শ্যামলালকো বোলাও।"

পিওন চলে গেলে আলকাতরা দিয়ে বার্নিশ করা বেঁটেখাটো এক যুবক ঘরে ঢুকল, "বলুন সার?"

"শোনো শ্যামলাল, তোমাকে আজই এক্ষুনি একবার কলকাতায় যেতে হবে।"

"সে খবর আমি অনেক আগেই পেয়ে গেছি।"

"তার মানে তুমি রেডিই আছ। আর শোনো, এইমাত্র স্টেশনমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা হল। আজ সিনিতে ব্লক ছিল। বি· আর· আই· মিঃ মাথুর সিনি থেকে মউভাণ্ডারে তাঁর মেয়ের বাড়ি এসেছিলেন। উনিও ফিরছেন এই গাড়িতে। তুমি ছেলেটার একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে ওকে মাথুর সাহেবের কাছে বসিয়ে দেবে। আর ওঁর অ্যাটেনডেন্ট পাসটা তুমি ব্যবহার করতে পারবে।"

শ্যামলাল বলল, "তা না হয় করলাম। কিন্তু তাতে লাভটা কী? অ্যাটেনডেন্ট পাসে আমি তো ফার্স্ট ক্লাসে যেতে পারব না। আমাকে বসতে হবে আলাদা বগিতে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে।"

"তাই বসবে।"

"তাই যদি হয় তো আমার আর ওর বডিগার্ড হয়ে অতদূর যাবার দরকার কী? ও তো একাই চলে যেতে পারে।"

দারোগাবাবু এক হাতে কপালের ঘাম মুছে বললেন, "ও মাই গড। ঠিক বলেছ তুমি। আসলে আমার মাথাটাই গেছে গোলমাল হয়ে। তুমি ওকে নিয়ে টিকিট কেটে সেকেন্ড ক্লাসেই যাও। আর দেরি কোরো না। রাতটা ওদের বাড়িতে কাটিয়ে কাল সকালের গাড়িতেই ফিরে আসবে কিন্তু। যাও, স্টেশনে চলে যাও।"

শুভঙ্কর শ্যামলালের সঙ্গে থানার বাইরে এল। এসে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন, রঙ্কিণী দেবীকে একবার প্রণাম করে যেতে পারি কী?"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। অতি অবশ্যই। বড় জাগ্রত দেবী। যাও, প্রণাম করে এসো।"

শুভঙ্কর মন্দিরের ভেতরে ঢুকল।

নাটমন্দির পার হয়ে একেবারে ভেতরে ঢুকে দেবী রঙ্কিণীকে প্রণাম করল শুভঙ্কর। তারপর জোড়হাতে প্রার্থনা করল, "মা, মাগো! আমাদের বিপদ কাটিয়ে দাও মা। বিল্টু, তিন্নি আর মউয়ের যেন কোনও ক্ষতি না হয়। আর সোনার গণপতি যেন আমরাই উদ্ধার করতে পারি।"

রঙ্কিণী ওর ডাক শুনতে পেলেন কি না কে জানে, তবে পূজারি ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে ওর ভক্তি দেখে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কী নাম তোমার?"

"আমার নাম শুভঙ্কর।"

"কোথায় থাকো? এখানে দেখিনি তো কখনও?"

"আমি থাকি কলকাতার কাছে। হাওড়ায়। আমাকে একটু চরণামৃত দিন।"

ব্রাহ্মণ শুভঙ্করকে চরণামৃত দিলেন। সেই সঙ্গে দেবীর প্রসাদী ফুলও একটু। শুভঙ্কর ফুলটা পকেটে রেখে চরণামৃত খেয়ে মাথায় হাত মুছে মন্দিরের বাইরে এল। সেখানে বিশাল হাড়িকাঠে মাথা

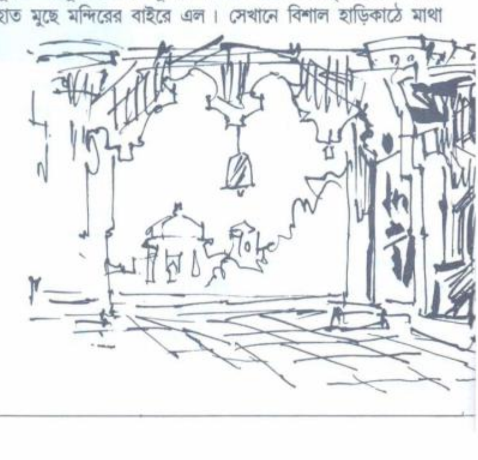

ঠেকিয়ে প্রণাম করল। শুভঙ্কর বাবার মুখে আগেই শুনেছে এখানে প্রতিবছর মহানবমীর দিন মহিষ বলি হয়। প্রণাম পর্ব শেষ করে শুভঙ্কর শ্যামলালকে বলল, "চলুন।"

শ্যামলাল একটা গাড়িতে উঠে কোনও দরদাম না করেই বলল, "স্টেশন।"

গাড়ি এগিয়ে চলল।

এখান থেকে ঘাটশিলা স্টেশন খুব একটা বেশি দূরে নয়। স্টেশনে চলে এল ওরা।

শ্যামলাল কাউন্টারে গিয়ে দুটো টিকিট কাটল। তারপর বলল, "এখনও হাতে একটু সময় আছে। যদি খিদে পেয়ে থাকে তো বলো। তোমাকে জলযোগ করিয়ে আনি।"

শুভঙ্কর বলল, "কোনও দরকার নেই। আগে ট্রেনে তো উঠি। পরে খিদে পেলে বলব। গাড়িতে তো সব কিছুই পাওয়া যায়।"

"তা যায়। ঝাড়গ্রাম, চাকুলিয়া, খড়্গপুর এখনও তিন জায়গায় থামবে ট্রেন। সব জায়গাতেই কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবে।"

ওরা ওভারব্রিজ টপকে ডাউন প্ল্যাটফরমে চলে গেল। এখানে চারদিকেই কাছে-দূরে শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

শুভঙ্কর শ্যামলালকে বলল, "আপনাদের এখানে এলাম বটে, কিন্তু এমন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম যে কিছুই আর দেখা হল না।"

"তুমি কপার মাইনস্ দ্যাখোনি? মউভাণ্ডার, মুসাবনি!"

"কিছু না। কত পাহাড়ে ওঠার শখ ছিল, তাও হল না।"

"সে কী! অন্তত ফুলডুংরিতেও তো উঠতে পারতে!"

"সময় পেলাম কই?"

"এই দ্যাখো ফুলডুংরি।"

"ওই লালমতো টিবিটা?"

"এখন গাছপালা কেটে নেওয়ায় ওটাকে টিবি বলে মনে হচ্ছে। এক সময় ওই টিবিই ছিল ঘাটশিলার আকর্ষণ। কত গাছপালা, লতাগুল্ম যে ছিল ওখানে তা ধারণাও করতে পারবে না। শুধু চিহড় লতাতেই ছায়াময় অন্ধকার করে রাখত পাহাড়টাকে। পাহাড় অবশ্য ঠিক নয়, এটাকে টিলা বলাই উচিত।"

শুভঙ্কর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফুলডুংরির দিকে।

এমন সময় হঠাৎ কিছু লোককে চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা গেল। তার মানে ট্রেন আসছে। সেই সঙ্গে নেমে আসছে সন্ধের অন্ধকার।

শ্যামলাল বলল, "ট্রেন আসছে।"

শুভঙ্কর দেখল বহুদূর দিগন্তে ছোট্ট একটি কালো বিন্দু। সম্ভবত এঞ্জিনের মুখ ওটা। স্টেশনে ট্রেন আসার ঘণ্টি পড়ল। শ্যামলাল বলল, "খুব একটা ভিড় নেই দেখছি আজ। আর মনে হয় লেটটাও একটু মেকআপ করেছে।"

ট্রেন থামল ঘাটশিলা স্টেশনে।

ওরা উঠে পড়ল একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। গাড়িতেও ভিড় খুব-একটা ছিল না। ওরা বেশ ভালভাবেই বসবার জায়গা পেয়ে গেল।

ট্রেন ছাড়ল। মাত্র দু' মিনিটের স্টপ। তাই থেমেই ছাড়ল।

একজন কফিওয়ালা কফি নিয়ে এল।

শ্যামলাল বলল, "কফি খাবে তুমি?"

"না। আপনি খান। আমি একবার বাথরুম থেকে আসি।"

"ঠিক আছে যাও।" বলে শ্যামলাল কফিওয়ালার কাছ থেকে

কফি নিয়ে মৌজ করে কফি খেতে লাগল।

আর শুভঙ্কর দুরুদুরু বুকে বাথরুমে যাবার নাম করে এগিয়ে এল গেটের কাছে। বুদ্ধুদা ওর কথামতো কাজ করবে তো ? না করলে কিন্তু সব ভেস্তে যাবে। যদিও পুলিশকে ধোঁকা দেওয়াটা মস্ত অপরাধ, তবুও এই মুহূর্তে এ ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই। ট্রেন ঘাটশিলা ছেড়েই ঝড়ের গতি নিয়েছে। ওর বুক কাঁপছে। তা হলে কি বুদ্ধুদা কথা রাখল না ?

এক অবাঙালি যাত্রী সতর্ক করে দিলেন শুভঙ্করকে, "আরে ভাই, দরোয়াজা বন্ধ করো। এ ক্যা কর রহে হো তুম। গির যাওগে।"

শুভঙ্কর একবার তাকিয়ে দেখল যাত্রীটির দিকে। তারপর একটু পিছিয়ে এসে দাঁড়াল। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেল ট্রেনের গতি কমে আসছে। খুশিতে ভরে উঠল বুক। বুদ্ধুদা তা হলে কথা রেখেছে। জয় মা রঙ্কিণী। ট্রেনের গতি হ্রাস পেতেই এক জায়গায় টুক করে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল শুভঙ্কর। ট্রেনটা একটু দূরে গিয়ে থামল। তারপর সিগন্যালে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে আবার ছুটতে লাগল হুহু করে।

শুভঙ্কর তো নেমে পড়ল। কিন্তু সেই অন্ধকার নির্জনে নেমে পড়েও ও কিন্তু ভয় পেল না। বরং খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা পাখির মতো মুক্তির আনন্দে উচ্ছ্বসিত হল। তবে এটাও ঠিক যে, শ্যামলালকে মিথ্যে কথা বলে এইভাবে পালিয়ে আসার জন্য বিবেকের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হল খুব। কিন্তু এই সময়টা এমনই এক সময় যে, এখন ওইসব দেখতে গেলে দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলের জীবনে চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে।

ও লাইন ধরে সোজা স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। একটু পরেই দেখতে পেল কে যেন সেই ছায়ান্ধকারে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ছায়ামূর্তি কাছে আসতেই শুভঙ্কর বলল, "কে, বুদ্ধুদা ?"

"হ্যাঁ, আমি। তোমার নামতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো ?"

"না। ঠিক জায়গা মতো নেমে গেছি।"

"আমি অনেক কষ্টে কেবিনম্যানকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছি। ও সিগন্যাল রেড করে রেখেছিল। তবে একথা কেউ কখনও যেন জানতে না পারে। তা হলে ও আমি দু'জনেই অসুবিধেই পড়ে যাব কিন্তু।"

"ও ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তবে তোমাকে কিন্তু আমার জন্য আর-একটা কাজ করতে হবে।"

"আবার কী কাজ ?"

"লক্ষ্মীটি, তুমি নিজে বা অপর কাউকে দিয়ে এখানকার স্টেশন মাস্টারের কাছে এক্ষুনি একটা খবর পাঠিয়ে দাও, ডাউন ইসপাত এক্সপ্রেসের 'ফোর জিরো টু জিরো ওয়ান' বগিতে শ্যামলাল নামে পুলিশের যে লোক হাওড়ায় যাচ্ছেন তিনি যেন পরবর্তী কোনও স্টেশনে নেমে আবার ঘাটশিলায় ফিরে আসেন। এটা করতেই হবে।"

"অসম্ভব। আমি এখানকার ছেলে। সবাই আমাকে চেনে। স্টেশনমাস্টার আমার বিশেষ পরিচিত। তা ছাড়া তুমি তো জানো না, বছর চারেক আগে আমি এখানে ক্যাজুয়েল লেবার হিসেবে কাজও করে গেছি। শুধু মাঝে-মধ্যে ক্যাশ থেকে টাকা চুরি করতুম বলে একবার ধরা পড়ে গিয়ে চাকরিটা খুইয়েছি। কাজেই আমি স্টেশনমাস্টারের কাছে এই কথা বলতে গেলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে। পুলিশে খবর চলে যাবে। ওর ভেতরে আমি নেই। তার চেয়ে তুমি চলে যাও। তোমাকে কেউ চেনে না।"

অগত্যা শুভঙ্কর নিজেই গেল। এবং স্টেশনমাস্টারকে সব কথা খুলে বলল। সব শুনে অবাঙালি এ. এস. এম. প্রথমেই শুভঙ্করকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুম কৌন হো ?"

শুভঙ্কর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বলল, "ধলভূমগড়ে গাড়িটা ঢোকার আগে সিগন্যাল না পেয়ে একবার কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। সেই সময় আমি নেমে পড়ি আর ট্রেনও ছেড়ে দেয়। চলন্ত গাড়িতে উঠতে সাহস হল না বলে থেকে যাই। এখন খবর না পাঠালে উনি চিন্তা করবেন। হয়তো হাওড়া পর্যন্ত চলে যাবেন।"

"লেকিন ট্রেন সে কাহে কো উতরায়া তুম ?"

"আসলে লাইনের ধারে একটা ঝকঝকে পিস্তল পড়ে থাকতে দেখে আমি নেমে পড়ি। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখি ওটা একটা খেলনা পিস্তল।"

"বহুত বুরা কাম কিয়া।" বলেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চাকুলিয়ার স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে টেলি যোগাযোগ করলেন। টরেটক্কায় কথা হল।

উনি যখন কথা বলতে ব্যস্ত শুভঙ্কর তখন হাওয়া। ওর দায়িত্ব শেষ। অযথা আর বিবেকের দংশনটা খেতে হবে না। শ্যামলালকে শুধু-শুধু হাওড়া পর্যন্ত পাঠানোর কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া ওকে দেখতে না পেয়ে ছটফট করবে বেচারি। অবশ্য ট্রেনের সহযাত্রী সেই অবাঙালি ভদ্রলোক যদি হইচই শুনে শ্যামলালকে ওর নেমে যাওয়ার কথা বলে দেন, তা হলে ঠিক আছে। না হলে শ্যামলাল হাওড়ায় যাবে। ওর বাড়ি জানে না, তাই বাড়িতেও খবর দিতে পারবে না। হাওড়া স্টেশনে সারারাত ছটফট করবে বেচারি। তার ওপর কর্তব্যে অবহেলার জন্য ওপরওয়ালার কাছে বকুনি খাবে। এমনকী, চাকরি থেকে সাসপেন্ডও হয়ে যেতে পারে। এখন তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ভূতের গল্প

১৯৮৯-এর অক্টোবরে অক্সফোর্ড প্রকাশন বিভাগ বের করেছেন ঝকঝকে নতুন পেপারব্যাক সংস্করণে 'দি অক্সফোর্ড বুক অব ইংলিশ গোস্ট স্টোরিজ' । গল্প আছে ৪২টি । দুটি গল্প চেনা, বেশ নামকরা । ডব্লিউ ডব্লিউ জেকবের

'দি মাংকিজ প' আর এম আর জেমসের 'ওহ, হুইসল, অ্যান্ড আই উইল কাম টু ইউ ল্যাড' । বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে আছেন ব্রাম স্টোকার, হেনরি জেমস, ই এফ বেনসন, সমারসেট মম, এলিজাবেথ বাওয়েন এবং আরও অনেকেই । পড়ে গা-ছমছম করে । নিয়নজ্বলা শহরেও অশরীরীদের আনাগোনা নিয়ে কোনও অবিশ্বাস থাকে না । সম্পাদনা করেছেন মাইকেল কক্স এবং এ গিলবার্ট । দাম ৭·৯৫ ডলার ।

সায়েন্স-ফিকশান কবিতা

সায়েন্স-ফিকশান সাধারণত লেখা হয় গদ্যে । অন্তত এতদিন আমরা তাই জানতাম । বাংলা সায়েন্স-ফিকশানের ভাণ্ডারও আজ বেশ সমৃদ্ধ । তবে, সবই গদ্যে লেখা । আসলে ফিকশান বলতে আমরা বুঝি গদ্যরচনা । কিন্তু ইংরেজিতে নতুন একটি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে আজকাল, 'সায়েন্স-ফিকশান পোয়েট', যার বাংলা করলে দাঁড়ায় সায়েন্স-ফিকশান কবি ! একটু অবাক লাগতে পারে । আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেশ কিছু লেখক সায়েন্স-ফিকশান লিখছেন, কবিতায় । তাতে থাকছে ছন্দ, মিল, কোথাও কোথাও কল্পনার একটু বেশি প্রভাব, কোথাও ভাষায় একটু স্বাধীনতা নেওয়া, কবিতায় যেগুলি মানানসই । কিন্তু তাই বলে ননসেন্স কবিতা এগুলি নয় । এর একটা গল্প আছে, চরিত্র আছে, ঘটনা-পারম্পর্য আছে । আর বিজ্ঞান আছে মূল ভিত্তি হয়ে ।

১৯৮৯ সালেই আমেরিকার সায়েন্স-ফিকশান পুরস্কার 'রিডারকন অ্যাওয়ার্ড' পেল একটি কবিতার বই । নাম 'কো-অরবিটাল মুন' । লেখক রবার্ট ফ্রেজিয়ার । ওশেন ভিউ বুকস । দাম : ৬·৯৫ ডলার । ইংল্যান্ড আর আমেরিকায় ফ্রেজিয়ার ছোটদের খুব প্রিয় 'সায়েন্স-ফিকশান কবি' । এই বইটিতেও তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন । নানা বৈজ্ঞানিক খটোমটো পরিভাষা যেন প্রাণ পেয়েছে তাঁর কবিতায়—তা সে মহাকাশ অভিযানের গল্প হোক, বা ডাক্তারি কাটাছেঁড়ার কাহিনীই হোক । পৃথিবীতে এই প্রথম কোনও সায়েন্স-ফিকশান পুরস্কার একটি কবিতার বইকে দেওয়া হল !

ঘোড়াদের নিয়ে বই

বইয়ের নাম 'ওয়ান্স আপন এ হর্স'। লেখিকা : সুজান জারমেইন । প্রকাশ করেছেন আমেরিকার লী অ্যান্ড শেপার্ড সংস্থা । বইয়ের বিষয় একটু অদ্ভুত । লেখিকা জানাচ্ছেন, ঘোড়াদের ইতিহাস আর মানুষের

ইতিহাসে ঘোড়ার ভূমিকা নিয়ে বইটি লেখা । সুদৃশ্য, সুপরিকল্পিত এই বই বিশেষভাবে ছোটদের জন্যই লেখা হয়েছে । এককথায় দারুণ ! সাহিত্য, ইতিহাস, যুদ্ধনীতি, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, জীব-বিজ্ঞান—সব কিছুই ছুঁয়ে আছে বইটি । অথচ ছোটদের শক্ত মনে হবে না এক লাইন, মনে হবে না একঘেয়ে কিংবা নীরস । পাতায়-পাতায় চোখ ধাঁধানো, মন ভোলানো ছবি । ছবিতে— ছবিতে ছয়লাপ । মানুষের সঙ্গে ঘোড়াদের সম্পর্ক কত বিভিন্ন রকমের হতে পারে তার বিস্তৃত আলোচনা । ১৪০০০ বছর আগের ফ্রান্সের গুহাচিত্রের ঘোড়া, ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ম্যাসিডোনিয়া থেকে পাওয়া ঘোড়া-আঁকা রৌপ্যমুদ্রা, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে পনি এক্সপ্রেস চালু হওয়া উপলক্ষে প্রকাশিত ঘোড়ার ছবি দেওয়া আমেরিকান স্ট্যাম্প ; এরকম অনেক রঙিন ছবিতে বইটি ভর্তি ।

কয়েকটি ভাগে বইটি ভাগ করা হয়েছে, 'দি ডন হর্স', 'দি সারভেন্ট', 'দি ওয়র্ক হর্স' এবং 'দি ফ্রেন্ড' । পাতা উলটে যেতে-যেতে মনে হয় যেন কোনও মিউজিয়ামে ঢুকেছি । ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে । দাম : ১৭·৯৫ ডলার ।

নিউজিল্যান্ডের দুই কিশোর

জনি ডার্টের বয়স উনিশ বছর । তার ভীষণ প্রিয় বোন পাঁচ বছর আগে দুর্ঘটনায় মারা গেছে । সেই শোক কিছুতে ভুলতে পারে না জনি । কিছুই তার ভাল লাগে না । থেকে থেকে বোনের কথা মনে পড়ে । একদিন রাত্তিরবেলা মন ভাল করতে শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, এমন সময় হঠাৎ আলাপ হল সফি নামের আর একটি ছেলের সঙ্গে । সফির মুশকিল এই যে, সে তার সব পুরনো কথা ভুলে গেছে । একজনের স্মৃতির অতিরিক্ত ভার, অন্যজনের স্মৃতিহীন জীবন—দুই কিশোরের বন্ধুত্ব, নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতা, এই নিয়ে সুন্দর এক কিশোরোপন্যাস লিখেছেন মার্গারেট মাহি । উপন্যাসের নাম 'মেমরি' । ডেল ও লরেল লিক প্রকাশন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বইটি প্রকাশিত । মার্গারেট মাহি নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক । সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে বইটি বেরোতে-না-বেরোতেই পুরস্কৃতও হয়েছে । দাম : ৩·২৫ ডলার ।

অভীক মজুমদার

ছড়ার দুটি বই

কলকাতার ছড়া
গড়গড়িয়ে তরতরিয়ে
সুনির্মল চক্রবর্তী
নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা-৭,
দাম : যথাক্রমে ছ'টাকা এবং দশ টাকা ।

ছোটদের জন্য এখন নানারকম বই লেখা হচ্ছে । কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ছড়ার সঙ্কলন 'কলকাতার ছড়া' । কলকাতাকে নিয়ে নানারকম ছড়া রয়েছে বইটিতে, সঙ্গে রয়েছে রাহুল মজুমদারের আঁকা সুন্দর সব ছবি । 'গড়গড়িয়ে তরতরিয়ে'

বইটিও ছড়ার । এই বইটিতেও দারুণ সব ছবির সঙ্গে আছে বাহান্নটি ছড়া । দেবাশিস দেবের আঁকা প্রচ্ছদটি সুন্দর । বই দুটি ছোটদের খুব ভাল লাগবে ।

কাজল চক্রবর্তী

নানারকম

ধাঁধা

টাইমপিসটায় কাল দম দেওয়া হয়নি নিশ্চিত । আজ সকালে উঠেই দেখি বন্ধ । কী ভাগ্যিস, আজ রবিবার । নইলে এরকম হঠাৎ বন্ধ হলে সকালের অ্যালার্ম বাজত না । ঘুম থেকে

উঠতে দেরি হত । সেই দেরির জের চলত সারা দিনের সমস্ত কাজে । দম-দেওয়ার চাবিটা ঘোরাতে-ঘোরাতেই ঘড়িটা চলতে শুরু করেছে । যাক, অন্য কোনও গোলমাল হয়নি । কিন্তু ঠিক ক'টা বাজে এখন ? রেডিও চলছে না । টেবিল-ঘড়িটা হাতে নিয়েই ছুটলাম ছোটকার চিলেকোঠার ঘরে । সমস্যার সমাধান তো হলই, সেই সঙ্গে উপরি মিলল ঘড়ি-মেলানোর একটা চমৎকার ধাঁধা ।

প্রথম ধাঁধা ॥ এক ভদ্রলোকের বাড়িতে একটাই ঘড়ি ; একটা দেওয়াল ঘড়ি । একদিন দুপুরে আবিষ্কার করলেন তিনি যে, দম দিতে ভুলে গেছেন গত দিন, দেওয়াল ঘড়ি তাই বহুক্ষণ ধরে বন্ধ । ঘরে অন্য ঘড়ি নেই । লোকালয় দূরে । ভদ্রলোক তখন ভেবে-চিন্তে একটা পথ বার করলেন । সোজা হেঁটে গেলেন বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত । ওখানে গির্জার ঘড়িটা নির্ভুল সময় দেয় । হেঁটে গেলেন, ওখানে সময় দেখে হেঁটে ফিরলেন । হাতে ঘড়ি ছিল না । কতটা সময় লাগল মোড় পর্যন্ত যেতে ও ফিরতে তা জানার সহজ পথ নেই, অথচ বুদ্ধির জোরে কী যেন হিসেব করে

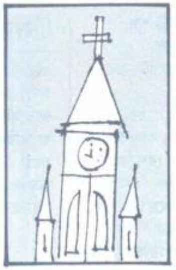

বাড়ির দেওয়াল ঘড়িটার সময় চমৎকারভাবে মিলিয়ে দিলেন ভদ্রলোক । বেশ ভালই মিলল সময় । ভদ্রলোকের হিসেবটা কী, বলতে পারো ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ পর-পর তিন সংখ্যার যোগফল তিনশো, সংখ্যা তিনটে কী কী ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

কেনাশরগ

গতবারের উত্তর ॥ (১) সাইকেল চালকেরা মুখোমুখি হবে ৬ ঘণ্টা বাদে । এই ৬ ঘণ্টাই সমানে ওড়াওড়ি করেছে মাছিটা । সুতরাং সে উড়েছে মোট ৩০×৬ বা ১৮০ কিলোমিটার । (২) ১১ (বন্ধনীর দু'পাশের সংখ্যার যোগফল বন্ধনীর অন্তর্গত সংখ্যার চারগুণ) । (৩) চাঁদের পাহাড় ।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

বাঁ হাত দিয়ে বাঁ হাতের কনুই ছোঁওয়া, কিংবা ডান হাত দিয়ে সেই হাতেরই কনুই ছোঁওয়া যে কী সাঙ্ঘাতিক রকমের অসাধ্য কাজ সেটা তো তোমরা জেনেই গেছ । এবং, অনুমান করতে অসুবিধে নেই যে, বন্ধুদের এখন দারুণরকমের বোকা বানাচ্ছ । এমনই আর-একটা অসাধ্য কাজের মজার তথা বোকা বানানোর খেলা এবার শেখা যাক । এবারের এই কাজটা যে একেবারেই অসম্ভব, তা

নাসাগ্রভাগ (অর্থাৎ নাকের সামনের দিকটা) স্পর্শ করো দেখি । মনে হয়, কিছুতেই পারবে না । পারবে না শুনেই, বন্ধুদের

অবশ্য জোর দিয়ে বলব না । হাজারে একজন কি দশ হাজারে একজন হয়তো মিলবে, যারা এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে । কারণ ঈশ্বরের কৃপায় হয়তো তাদের জিভ এমনই অস্বাভাবিক রকমের লম্বা যে, তারা তাদের সেই লম্বা জিভের সাহায্যে এই কাজটা করে ফেলতে পারবে । কিন্তু কে পারে, আর কে-কে পারে না সেটা তো যাচাই করার ব্যাপার । আর তাই খেলাটা শিখতে হবে প্রথমে । খেলাটা একটা চ্যালেঞ্জ । বন্ধুদের তুমি বলছ, নিজের জিভ দিয়ে তুমি নিজের জেদ চেপে যাবে । তারা প্রত্যেকেই মা কালীর মতো জিভ বার করে নাক ছোঁবার চেষ্টা করবে । কেউ-কেউ একবার-দু'বার করেই বুঝে যাবে, কাজটা অসম্ভব । কেউ-কেউ চেষ্টা করেই যাবে । আর এই চেষ্টা করার মুহূর্তেই মজা । সুতরাং দেরি কেন । প্রথমে নিজে একবার চেষ্টা করো । তারপর থেকে বন্ধুদের বলো পারে কি না । তবে সত্যি যদি কেউ পেরে যায়, তাকে একটা চকোলেট অন্তত পুরস্কার দিতে ভুলো না ।

মজারু

শব্দকথা

'বকলমা' শব্দটির মধ্যে পর-পর কী কী শব্দ খুঁজে পেতে পারো ?

২ । একই শব্দের দুটো করে অর্থ থাকবে—এমন চারটি শব্দ ভাবতে হবে । আন্দাজে ভাবতে হবে না, প্রতিটি শব্দের দুটো করে অর্থই দেওয়া থাকল । এই অর্থের বঁড়শিতে শব্দ-চারটিকে গেঁথে তোলো তো ! (ক) আদা, রামায়ণে উল্লিখিত নগর । (খ) পালন, একটি প্রধান ভারতীয় ভাষা । (গ) দংশক পতঙ্গ, ভিস্তি । (ঘ) সমুদ্র, যে-দস্যু পরে

ঋষিকবি হয়েছিলেন ।

৩ । নীচে তিনটি শব্দ দেওয়া হল । অক্ষর উলটে-পালটে এই শব্দ-তিনটিকে অন্য শব্দ বানাও :

(ক) অগতি । (খ) অকাল । (গ) খরচ ।

উত্তর : ১ । বক, কল, কলমা, মা—মোট চারটি শব্দ । ২ । (ক) শৃঙ্গবের । (খ) তামিল । (গ) মশক । (ঘ) রত্নাকর । ৩ । (ক) অতিগ । (খ) অলকা । (গ) খচর ।

কথক

মুখে ফুটে ওঠে চরিত্র,
দেখলেই বোঝা যায়
hmt
QUARTZ
এদের পেছনে রয়েছে এইচ্ এম টির অভিজাত টেক্নলজি এবং বিক্রীর পর সেরা। সবচেয়ে সেরা, অন্যদের থেকে আলাদা, চরিত্র বলে।
hmt
QUARTZ
everest/S89/485 BEN

ANANDAMELA 21 FEBRUARY 1990 REGD.NO.
WB CC 264 MH BY SOUTH 683 TN MS(C) 731